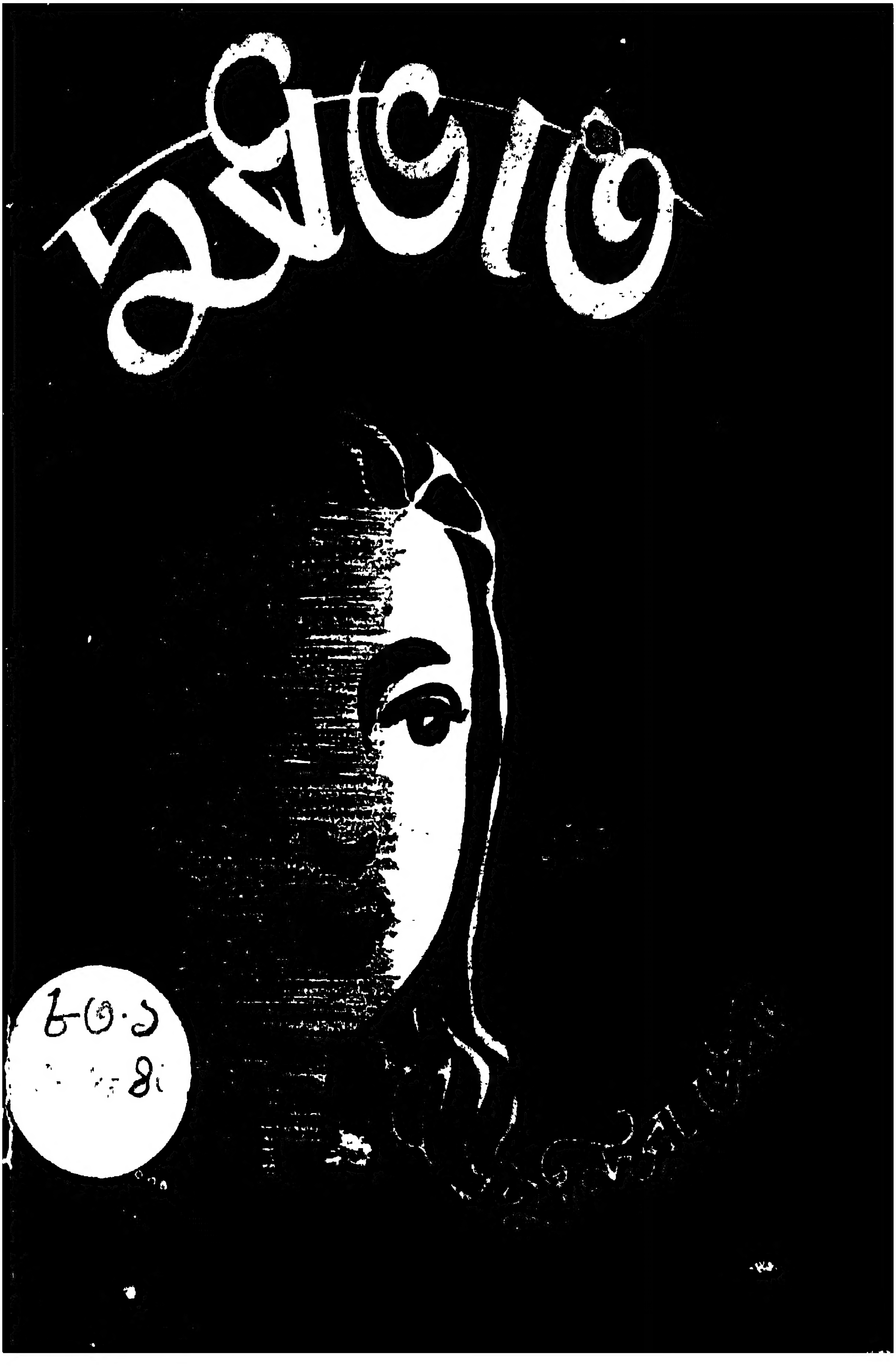

College Special Form No. 38.

MAHARAJA
BIR BIKRAM COLLEGE
LIBRARY

Class No. ৮৬.১

Book No. ক্র.৫-৪০

Accn. No. ৬১৬০

Date ২০.৭.৮[illegible]

TGPA—18-6-69—10,000.

College Form No. 4.

GOVERNMENT OF TRIPURA

. . ..Library

This book was taken from the Library on the date last stamped. It is returnable within 14 days,

TGPA—18-11-72—M.B.B.C.—4,000.

দুধ-ভাত

ইন্দিরা দেবী

2130
RY
10.7.54
...artala.

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

এক টাকা চার আনা

অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

'দুধ-ভাত'এর গল্পগুলি রেডিওতে বলা আর কয়েকটি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলি ছোটদের উৎসাহে আর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ-এর সৌজন্যে প্রকাশিত হলো। ছোটরা খুসী হ'লেই সব সার্থক হবে।

কলিকাতা
অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

ইন্দিরা দেবী

দুধ-ভাত

দুধ-ভাত	...	১
শিউলি	...	৮
ধীরে ধীরে ফল ফলে	...	২০
শিবু	...	২৯
ঠাকুর্দা	...	৩৫
ছায়া	...	৪৬
বেচারা	...	৫৩
তারা যদি কথা কইতো	...	৬০
ছবি	...	৬৮
বন্ধু	...	৭৪

অরুণ আর অলককে— ।

দুধ-ভাত

মিণ্টু বড় মুস্কিলে পড়েছে। সকালে, রাতে যখনই সে ভাত খাবে—দুধ-ভাত খেতেই হবে—আশ্চর্য! এত ব'লে কয়ে কিছু হয় না—ঠাকুমা, মা শেষ পর্যন্ত ছোটকা বড়দা পর্যন্ত বলবে: খা রে মিণ্টু, দুধ-ভাত খা, ভারী ভালো জিনিস।

ছাই ভালো! মনে মনে গর্জে উ'ঠে মিণ্টু বলে। আহা-হা ভালো, তাই ওঁরা খান না—কেবল মিণ্টু দুধ-ভাত খাবে। কেন খাবে ঐ ছাইগুলো? ওর একটুও ভালো লাগে না। বিশেষ ক'রে ছোটকা যখন বলে তখন তো তার মারতে ইচ্ছা করে। ছোটকা যে কী ভীষণ বাজে কথা বলে, তা মনে হ'লে রাগে আর মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। সেবার দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে যখন সে হেঁটে আসতে পারছিল না—তখন ছোটকা বলেছিল: মিণ্টু জোর জোর পা চালিয়ে চলো, আমরা রাজার বাড়ী যাবো, সেখানে রাজকুমার ব'সে আছে। সেই যে রাজপুত্রের গল্প তুমি শুনেছিলে—সেই রাজপুত্র। ঝলমলে পোষাক প'রে মাথায় উষ্ণীষ, মুক্তোর মালা গলায়—সেই

রাজপুত্তুর পক্ষিরাজ ঘোড়া নিয়ে আছে, আমরা গেলে দেখা ক'রে তবে সে পক্ষিরাজে ক'রে বেড়াতে যাবে।

সেদিনের কথা মিণ্টুর পরিষ্কার মনে আছে।—অনেক কষ্ট ক'রে সে যখন বাড়ীর কাছাকাছি প্রায় এলো: কই ছোটকা, রাজপুত্তুর? ছোটকা বললেন: ঐ যে দেখছ দূরে বন্ধ বড় বাড়ীটা, ঐটায় রাজপুত্তুর থাকে—আর ঐ তার ঘোড়া। মিণ্টু দেখলো একটা বন্ধ বাড়ী বটে, কিন্তু যেমন বাড়ী সে ভেবেছিল তেমন নয়, আর ঘোড়া? আরে রাম—যে রোগা রোগা ঘোড়াগুলো নিয়ে বাবুরা ভাড়া ক'রে চ'ড়ে বেড়ায়, তারই একটা শুকনো ঘোড়া সেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় সোয়ারী নেবে—ঐ নাকি ছাই পক্ষিরাজ!

ছোটকার উপর সেদিন তার কি না রাগ হয়েছিল! পরে সে নিজের কানে শুনেছে ছোটকা বলছে: মিণ্টুটা কি হাঁটতে চাইছিল? রাজপুত্তুরের কথা বলাতে ও হেঁটে এলো।

উঃ, কী ভীষণ মিথ্যেবাদী! অথচ ওকে বললে: আমাদের আসতে দেরী হ'য়ে গেছে কিনা তাই রাজপুত্তুর লেখাপড়া করতে চ'লে গেছে, আবার পরে একদিন আসবে।

সেই থেকে ছোটকার উপর তার যা রাগ আছে। আবার বলা হয়, মিথ্যে কথা বলতে নেই।

কিন্তু আজকে তার সব চেয়ে রাগ—দুধ-ভাত নিয়ে। আজ সে একটা কাণ্ড করবেই। দুধের বাটি যদি উল্টে না দেয় তাহ'লে তার নামই মিণ্টু নয়। আর বাড়ী থেকে সে আজ চ'লে যাবে যেদিকে তার চোখ যায়। এ কথার আর কোনো নড়চড় নেই।

আজ স্কুল নেই, রবিবার—মা, ছোট কাকিমা সবাই রান্নাঘরে।

আজ ভালো ভালো রান্না হচ্ছে, সব্বাই আজ বাড়ীতে আছে। আরো কারা যেন সব আসবে। মিণ্টু পড়া সেরে একবার রান্নাঘরে গেল। —সত্যিই আজ অনেক ঘটা রান্নাঘরে। ঠাকুমা পর্য্যন্ত এসে গেছেন রান্নাঘরে।—মা উনানের পাশে ব'সে বড় বড় মাছের খণ্ডগুলো ভেজে তুলছেন, ঠাকুমা তদারক করতে করতে বলছেন : এবার মালাইকারীটা চড়িয়ে দাও বড় বৌমা। ছোট বৌমা, এ দুধটা কিসের গা, মালাই-কারীর ?

ছোট কাকিমা বললেন : না, না, এ দুধ জ্বাল দিলাম এবার বাটিতে তুলবো, মালাইকারীর দুধ পাথর বাটিতে আছে। এই ব'লে ছোট কাকিমা সারি সারি বাটিতে নাম ক'রে ক'রে দুধ তুলতে লাগলেন—এটা সন্তুর, এটা নাণ্টুর, এটা হলো ছোট খোকনের—এটা মিণ্টুর।—ব্যস, মিণ্টুর আর দেখতে হবে না, ছিটকে বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে। আজ যদি সে বাড়ীতে ভাত খায়, কী বলেছে ! সন্তু, নাণ্টু, ছোট খোকন ওরা হলো একরত্তি ছোট্ট, ওরা দুধ-ভাত খাবে। মিণ্টু এখন বড় হয়নি ? আর কোনো কথা নেই—কেবল দুধ-ভাত।

মিণ্টুর তাড়াতাড়ি ক'রে বেরিয়ে আসা দেখে মা একবার ডাকলেন : মিণ্টু, কোথায় যাচ্ছ ? এসো না, ক্ষিদে পেয়েছে ?

মিণ্টুর তখন চোখে জল এসেছে—ক্ষিদে পেয়েছে। দূর থেকে চেঁচিয়ে মিণ্টু বললে : না ক্ষিদে পায়নি—আমি মনুদের বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছি।

—শীগ্‌গির এসো কিন্তু।

শীগ্‌গির এসো ! সবাই ভালো ভালো জিনিষ খাবে আর মিণ্টুর জন্য দুধ-ভাত ! মিণ্টু আর এ বাড়ী এসেছে !—মনে মনে এই কথা

ব'লে মিণ্টু রাস্তায় বেরিয়ে সোজা মনুদের বাড়ী গিয়ে উঠলো। ওদের বাড়ী গিয়ে একদল বন্ধুবান্ধবদের মাঝে খেলাধুলো পেয়ে মিণ্টু যে দুঃখ নিয়ে বেরিয়েছিল সব ভুলে গেল।

অনেকক্ষণ খেলাধুলোর পর মনুর মা ডাকলেনঃ সবাই খাবে এসো।

মিণ্টুর মনে হলো এবার বাড়ী যেতে হবে।—আবার তার দুধ-ভাতের কথা মনে হলো। সে ঠিক করলে এখান থেকে পাখীদের বাড়ী যাবে। এমন সময় মনুর মা বললেন ঃ এসো মিণ্টু, খাবে এসো।

—না, আমি খেয়ে—না, বাড়ী যাবো। অস্পষ্ট ক'রে মিণ্টু কি যে বললে বোঝা গেল না।

মনুর মা বললেন ঃ তোমাদের চাকর ডাকতে এসেছিল, আমি ব'লে দিয়েছি ও এখানে খেলছে, খেয়ে দেয়ে পরে যাবে। মিণ্টু চুপ ক'রে রইল। ভাবলো মনু নিশ্চয় দুধ-ভাত খায় না। যাক—বাড়ীর রাগটা তাহ'লে বেশ জমবে।—কিন্তু বাড়ীতে আজ অনেক ভালো ভালো রান্না হচ্ছে।

মনু, মিণ্টু আর সব ছোটরা খেতে ব'সে পড়লো—খুব হাসি গল্প, মজা ক'রে খাওয়া হচ্ছে। মনুর মা একবার এসে দেখে গেলেন ঃ কি নিবি রে? মিণ্টু ভালো ক'রে খাও, লজ্জা করো না। ও ঠাকুর! দুধের বাটিগুলো নিয়ে এসো।

মিণ্টুর সব আনন্দ নিবে গেছে!—য়্যাঁ, এখানেও দুধ?

—না মাসীমা, আমি দুধ খাবো না, পেট ভ'রে গেছে।

—না, না, সেকি হয়, একটু দুধ-ভাত না খেলে ছোট ছেলেপিলে বাঁচবে কি ক'রে?

বাড়ীতে রাগ চলে, কিন্তু পরের বাড়ীতে ?

অগত্যা মিণ্টুকে— ।

ওখান থেকে সে পাখীদের বাড়ী গেল। আজ রবিবার, খুব ক'ষে খেলার দিন। বিকেল হয়ে এলো, মিণ্টু বাড়ী যাবার নাম করে না। সে তো বাড়ী যাবে না ঠিকই ক'রে ফেলেছে। পাখীর মা সবাইকে জলখাবার আর চা দিলেন, আর মিণ্টুকেও। মিণ্টু অবশ্যই আপত্তি করেছিল, কারণ ওর ভীষণ লজ্জা করে অন্য জায়গায় খেতে। কিন্তু তাহ'লে কি হয়, পাখীর মার কাছে কোনো আপত্তিই টিঁকলো না। খাবার চা খেতে খেতে এলো এক বাটি দুধ।

—খেয়ে নাও মিণ্টু, চা খাও না-খাও দুধটা খাও।

মিণ্টু দু'বার ঢোঁক গিলে দুধটার দিকে তাকিয়ে ভাবলো, কিজন্য সে আজ সারাদিন বাড়ী ছাড়া।

কিন্তু মিণ্টুকে খেতেই হলো— অগত্যা— ।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সারাদিন হৈ চৈ ক'রে মিণ্টুর চোখ বুজে আসছে। কোথায় যায় ? আচ্ছা, আজ চুপচাপ লুকিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়িগে, সকালবেলা উঠে আবার ভাববো কি করা যায়, কোথায় যাওয়া যায়।

মিণ্টু আস্তে আস্তে বাড়ী ঢুকলো। সন্তু বাইরের ঘরে পড়ছিল, মুখ তু'লে মিণ্টুকে দেখে বললেঃ এই যে ছোটদি! সারাদিন কোথায় থাকা হয়েছিল শুনি ?

মুখ ভেঙিয়ে মিণ্টু উত্তর দিলঃ যেখানেই থাকি তোর কি ?

—যাও না, হবে'খন, আজ খাবার সময় ছোটকা খুঁজছিল, বড়দা

ডাকছিল মিণ্টু, মিণ্টু ক'রে। আজ কি খাওয়ার ঘটা ছোটদি, বুঝলি! সন্তু জিব দিয়ে তার ঠোঁটটা একবার চেটে নিলো।

—যা, যা, তোর মত আমি লোভী নই। মিণ্টু সোজা শোবার ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

ইস্! রাজ্যের ঘুম চোখে মিণ্টুর।

—মিণ্টু, ওঠো লক্ষ্মী মেয়ে! সারাদিন খাওনি। মায়ের কণ্ঠস্বর ঘুমের আমেজের মধ্যে শোনা যায়।

—এত রান্না বান্না, লোকজন খেলো, একটা মেয়ে বাড়ীতে, সে যে খেলো না, তার খোঁজ হলো না, তোমাদের আক্কেল কি গো বৌমারা! —দূর থেকে শোনা যায়, এ কণ্ঠ ঠাকুমার।

—না মা, ওকে আনতে পাঠানো হয়েছিল, মনুর মা হরিকে ফেরৎ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এখানে খাবে।—তা ওর জন্য সব আছে তো—নরম কণ্ঠ, এ হলো ছোট কাকিমার।

—মিণ্টু কই রে? কখন এলো? সারাদিন খুঁজে পাইনা।—এই কণ্ঠস্বর শুনলেই মিণ্টুর রাজপুত্তুরের কথা মনে পড়ে। ছোটকার কণ্ঠস্বর।

—মিনু মামণি! ওঠো তো মা, যাও খেয়ে নাও গে, সারাদিন খাওনি। বাবার আদরভরা কণ্ঠস্বর শুনলে সব রাগ জল হয়ে যায়।

ঘুমের ভিতর মিণ্টু মার হাত ধ'রে উঠলো। মুখ ধুয়ে যখন খেতে বসছে, সন্তু বলছে: এই ছোটদি, চোখ তাকিয়ে খা না, কত কি খাচ্ছিস দেখ ভালো ক'রে।

—যা, যা, লোভী কোথাকার—ঝাঁঝিয়ে উঠলো মিণ্টু। তারপর খেতে আরম্ভ করলো।

—খাচ্ছিস তো মিণ্টু, খা, খা।—বড়দা পাশ দিয়ে বাইরের ঘরে চলে গেলেন।

—এই তো মিণ্টু, কোথায় ছিলে মা সারাদিন? মাথাটা নেড়ে দিয়ে ছোটকা বেরিয়ে গেল।

ছোটকার গলা পেয়ে মিণ্টুর চোখের ঘুমটা একটু ছেড়েছে। চোখ তাকিয়ে দেখলো অনেক সব খাবার জিনিসের মাঝে সে ব'সে আছে, সামনে সন্তু আর নাণ্টু গপ্ গপ্ গপ্ ক'রে খাচ্ছে।

ছোট কাকিমা বললেন: ভালো ক'রে চোখ চাও মিণ্টু, এই নাও—দুধের বাটি, সব শেষে দুধ-ভাত খাবে—দেখো যেন বেড়ালে মুখ না দেয়।

মিণ্টুর চোখের ঘুম একেবারে ছেড়ে গেছে।

অগত্যা—!

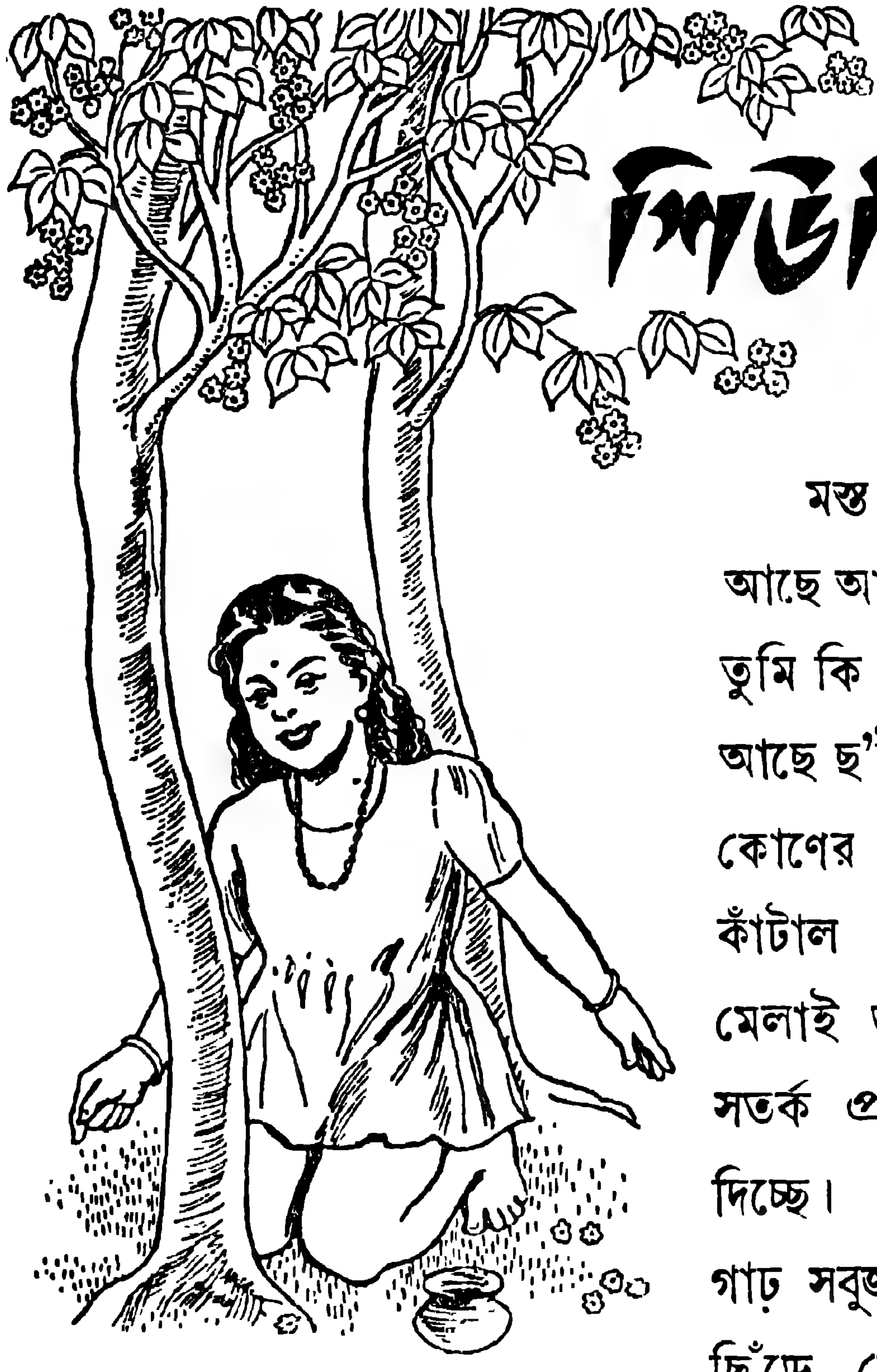

শিউলি

মস্ত বাগান! কি গাছ আছে আর কি নেই! তুমি বল তুমি কি চাও? আম গাছই আছে ছ'টা, সব রকমের আম। কোণের দিকে একটা বুড়ো কাঁটাল গাছ ঝাঁকড়া মাথায় মেলাই ডালপালা বা'র ক'রে সতর্ক প্রহরীর মত পাহারা দিচ্ছে। কাগজি লেবুর গাছটা গাঢ় সবুজ, লেবুগুলোই সবাই ছিঁড়ে নেয় কিন্তু গাছটার দিকে কেউ লক্ষ্য করে না, যেন তার কোনো দরকার নেই। কিন্তু তাই ব'লে কি সে চুপ ক'রে ব'সে আছে? মোটেই না, ঘর-সংসার বেড়েই গেছে, পাতায় ডালপালায় ছড়িয়ে পড়ে সে বেশ খানিকটা স্থান দখল ক'রে আছে—তবে বড় ম্রিয়মাণ।

ওদিকে ছেড়ে এবার এদিকে এসো, বড় একটা স্থলপদ্মের গাছ, পাশের পঞ্চমুখী জবার সঙ্গে মিতালী করেছে; ওরা দু'জনে পাশাপাশি থাকে, ফুটে ওঠে গাছ আলো ক'রে, ঝলমলিয়ে। পাতায়

ডালে ওরা যেন এক হয়ে এসেছে, তবে স্থলপদ্ম বেশ উঁচু জাতের ব'লে গাছটাও লম্বা হয়ে উঠেছে বেশ, ও' যেন আকাশের সঙ্গেও আলাপ করতে চায়। ঐ দূরের লম্বা লিলিগুলো আর চন্দ্রমল্লিকারা হাসাহাসি ক'রে এই কথাই বলে। আর চারদিকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে কৃষ্ণকলি, টগর, কুন্দ, দোপাটি, অপরাজিতা, কাঠচাঁপা—এরা তো মেজ, ছোটর দল, কাজেই বড়র দলে ঘেঁষেনা বড় একটা।

আচ্ছা এসব ছাড়িয়ে চলে এসো একেবারে দক্ষিণ কোণে, যেখানে একজোড়া শিউলি গাছ পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে আছে। একসঙ্গেই এরা ছোট থেকে বড় হয়েছে, উঁচু ডালগুলো গিয়ে ঠেকেছে পাঁচিল পার হয়ে একেবারে লাহিড়ীদের জানলার গোড়ায়। ওখান থেকে অনায়াসে ছোঁয়া যায় গাছটাকে। আর ওদের বাড়ীর কাজল মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে ছোট হাত বাড়িয়ে গাছটি ছোঁয়। একদিন সে পাতা ছিঁড়ে দেখেছিল আঠার মত কি লাগে। অনেক ভেবে কাজল বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। বাবা বললেনঃ ওদের লাগে কিনা মামণি, তাই ঐ আঠার মত দেখেছ, তুমি আর ছিঁড়োনা বিনা দরকারে।

সেইদিন থেকে কাজল আর গাছের পাতা ছেঁড়ে না। মাঝে মাঝে এসে জানলায় বসে, গাছটায় হাত দেয়। বাবার কথা সে মনে রেখেছে—আহা ওদেরও লাগে। ওখান থেকে কাজল প্রায়ই তার বন্ধু রুমঝুম-এর সঙ্গে কথা বলে। রুমঝুম এই বাগানওয়ালা বাড়ীর মেয়ে। আর বাগানের ভিতর এই শিউলি গাছের নীচেই তার খেলবার জায়গা। সকালে এসে সে গাছ দু'টির উজাড় ক'রে দেওয়া শেফালীগুলি একটি একটি ক'রে কুড়োয়—বেশ খানিকটা

ঘিরে যেন সাদা হয়ে থাকে—রুমঝুম দূর থেকে দেখে যেন বরফের কুচি কে বিছিয়ে রেখেছে—তুষারশুভ্র শেফালীদলের দিকে চেয়ে সে চোখ ফেরাতে পারে না। অনেকক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে এসে একটি সাজিতে আস্তে আস্তে তাদের উঠিয়ে নেয়। তার ফুল ওঠানোর সময়টুকু কাজল জানে, তাই সে-সময় সেও ঐ জানলাটির ধারে এসে বলে ঃ ফুল কুড়োচ্ছ রুমঝুম ?

—হ্যাঁ ভাই কাজল, বেলা হ'লে রোদ উঠলে এরা কেমন লালচে হয়ে আসে, আমার এত কষ্ট হয়। এত সাদা আর সতেজ তো থাকে না। কিন্তু আরো দুঃখ হয়, বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখলেই ছোটদি আর ছোট মাসী বোঁটাগুলো ছিঁড়ে রোদে শুকাতে দেয়, সাদা দলগুলো ফেলে দেয়। ওদের ঐ অবস্থা দেখলে আমার কান্না পায় কাজল—জানো ?

কাজল সান্ত্বনা দেয় ; এমনি রাখলেও তো ওরা থাকবে না ভাই।

—কিন্তু কি জানি কাজল, আমার মনে হয় ওদের লাগছে।

দু'জায়গায় ব'সে দু'বন্ধু মনের কথা ব'লে যায়—আর নির্বিকার হয়ে জোড়া শেফালী গাছ শোনে সে সব। রুমঝুমকে তারা ভালবাসে নাকি ? তা না হ'লে সকালে রুমঝুম বাগানে আসবার আগেই সব ঢেলে দেয়—যেন স্নেহে ভালবাসায় রুমঝুমকে তারা সব উজাড় ক'রে দিয়ে দিচ্ছে।

বাগান পরিষ্কার করতে আসে মালী, শুকনো পাতা কুড়ায়, ছোট ছোট ফুলগাছগুলিতে জল দেয়, ফুলগুলি অযথা কেউ ছিঁড়ে না নষ্ট করে তাও দেখে। কিন্তু রুমঝুম বলে ঃ তুমি কেন আস মালী, আমি সব ক'রে দেবো।

বুড়ো মালী হাসে।

জোড়া শিউলি ঝর ঝর ক'রে ফুল ঢেলে দেয়—সে কি বুঝতে পারে নাকি রুমঝুমের কথা? কি জানি!

মা বলেন: মেয়েটা কি বাগানেই থাকবে, ঘরে আসার নাম নেই। এমন মেয়ে দেখিনি, বাবা!

ছোটদি বলে: ঐ তো শিউলি গাছের তলে ব'সে আছে, কোথাও যায় না।

বাবা স্নেহভরে বললেন: থাকনা, বাগান তোমার মতো সাত মাইল দূর নয়, পাশেই বাড়ী, ওতো দূরে কোথাও যাচ্ছে না।

ছোট মাসী মাকে লক্ষ্য ক'রে বলেন: তা যাই বলো দিদি, এমন ফুল-পাগল মেয়ে আমি দেখিনি। সেদিন সকালে সাজি ভ'রে শিউলি ফুল এনেছে, আমি বোঁটা ছাড়িয়ে রোদে দিয়েছি—ওর কী কান্না, বলে কিনা: অমন ক'রে ছেঁড়ো কেন? জানো ওদের লাগে?

আমি বললুম: তোদের শাড়ী রাঙিয়ে দেবো ব'লেই তো বোঁটা শুকোচ্ছি। বললে: আমি অমন শাড়ী পরতে চাই না।

বাবা স্নেহস্বরে বলেন: আহা থাকনা, ফুল একটু ভালবাসে বেচারা।

কিন্তু বাবা কোনো সমর্থন পেলেন না।

যার উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলা হচ্ছে, সে তখন জোড়া শিউলি গাছের নীচে ব'সে তাদের সঙ্গেই গল্প করছে।

বিকেলে জলখাবার জন্য রুমঝুমকে ডেকে কোথাও পাওয়া গেল না। মা বললেন: কোথায় আবার যাবে, নিশ্চয়ই ঐ শিউলি গাছের কাছে আছে।

রাঙাদি রুমঝুমকে খুব ভালবাসে। সে বললেঃ তোরা গোলমাল করিসনি, আমি যাচ্ছি ডেকে আনছি।

চুপি চুপি বাগানে এসে দেখলে জোড়া শিউলির মাঝের সামান্য ফাঁকটিতে ব'সে রুমঝুম কার সঙ্গে খুব হাসছে আর গল্প করছে। রাঙাদি অবাক হয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে এমন কি লাহিড়ীদের বাড়ীর জানলায় কাজল আছে কিনা তাও দেখতে ভুললে না। কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই।

রাঙাদি শুনছে রুমঝুম বলছেঃ তা বলুক না ঐ গাছরা চুপি চুপি কথা, তোমরাও তো দু'জনে গপ্পো করো, বলোনা তোমাদের কি লুকানো কথা আছে, সত্যি আমি কাউকে বলবো না।

অপর পক্ষের কথা কিন্তু রাঙাদি জানতে পায় না।

রুমঝুম খিল খিল ক'রে হেসে বললেঃ সত্যি বলছো তোমাদের কোনো লুকানো কথা নেই—তোমরা কেবল সবাইকে ধন্যবাদ দাও? কিন্তু সে আবার কি, সব সময় ধন্যবাদের ঘটা ভালো নাকি? আমি কবে কস্মিনে এক আধবার বলি, খুব মজা লাগলে আর খুশি হ'লে। রুমঝুম আবার চুপ ক'রে কি যেন শুনছে—। একটু পরে আবার বললেঃ নিশ্চয়ই কেন? সব সময়—কারণে অকারণে—?

রাঙাদি অবাক হয়ে শুনছে, রুমঝুম তখনও বলছেঃ ওঃ তাই বলো, তোমরা প্রকৃতিকে সব সময় ধন্যবাদ দাও, আকাশের আলো, বৃষ্টির জল, সুস্নিগ্ধ বাতাস, নরম মাটি, যেখানে তোমরা আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আর পাখীর মিষ্টি গান, রাত্তিরের নিস্তব্ধ অন্ধকারের ঝলমলে তারার সারি—এদের তোমরা সব সময় ধন্যবাদ দাও?

রুমঝুম আবার থামলো, রাঙাদির বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

—হ্যাঁ, ওরা তো আমাদের বন্ধু, ওদের সঙ্গ না পেলে, স্পর্শ না পেলে আমরা বাঁচবো কি ক'রে? জানো শিউলি ভাই, আমি রাতে খাটে শুয়ে জানলা দিয়ে যখন আকাশের ঝলমলে তারাগুলো দেখি, ভাবি—তোমরাও তো দেখছো, কিন্তু একলা তোমাদের ভয় করছে কিনা—কিন্তু তারপর ভাবি আমি যেমন মার কাছে ঘুমোই, তোমাদেরও তো এখানে কত বন্ধুবান্ধব রয়েছে। কিন্তু সত্যি বলেছ শিউলি, এই আলো, জল, হাওয়া, নরম মাটি—এসব না পেলে আমরা বাঁচতাম না। আর ঝলমলে তারার মালা, পাখীর গান—এসব না শুনলে, না দেখলে কিছু ভালো লাগতো না।

রুমঝুম!

রুমঝুম ভয়ানক আহত হয়েছে যেন, বললে: কি রাঙাদি, এখন কি বলছো?

রাঙাদির দৃষ্টি তখনও কাকে এদিক ওদিক অন্বেষণ করছে: কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

রুমঝুম হেসে বললে: ওঃ তাই বলো, ওরা আমার বন্ধু।

কই তারা? রাঙাদির কণ্ঠে আগ্রহ।

—তোমার সামনেই তো দাঁড়িয়ে আছে, দেখছো না?

—কই? কোথাও তো কেউ নেই।

রুমঝুম খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে—দু'হাত দিয়ে শিউলি গাছের গোড়াটা জড়িয়ে ধ'রে বলে: আচ্ছা শিউলি ভাই—রাঙাদি বলছে কেউ নেই।

রাঙাদির এবার রাগ হয়ে গেছে, গম্ভীর কণ্ঠে বললে: বেশ তুমি এখন চলো, খেতে ডাকছে।

রুমঝুম বললে : আমার ক্ষিদে পায়নি রাঙাদি, তুমিও বসো না এখানে—কি সুন্দর হাওয়া আর ফুলের সুবাস। আর এই জায়গাটা আমি পরিষ্কার ক'রে রেখেছি।

রাঙাদি বিরক্ত হয়ে বললো : না চলো, এখনি যেতে হবে, তারপর আজ ফুলুমাসীর বাড়ী যাবার কথা আছে—তোমাকেও যেতে হবে।

রুমঝুমের এসব ভালো লাগে না। ওর নিবিড় বন্ধুত্ব শিউলিদের সঙ্গে। তবুও ম্লান মুখে উঠতে হলো।

মা বললেন বাবাকে : দেখ, মেয়েকে স্কুলে দাও, ও নিশ্চয় পাগল হয়ে যাবে। দিনরাত ঐ শিউলি গাছের নীচে ব'সে আছে, কার সঙ্গে কথা বলে, লোক নেই জন নেই। মাঝে মাঝে কেমন সুন্দর গান করে। কিন্তু বাড়ীতে ব'সে গান করতে বলো, কিছুতেই করবে না। ওভাবে থাকলে ও নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাবে।

বাবা হাসলেন : না, না, বাচ্চা মেয়ে, খেলাধুলো করে, বাগানে থাকতে ভালবাসে, শিউলি ফুল ভালবাসে—পাগল হবে কেন?

মা কিন্তু স্বস্তি পেলেন না, তাছাড়া বাজে কথা বলার লোকের তো অভাব নেই। মা ভাবলেন কি জানি এ আবার কি রোগ!

রুমঝুমকে খুব সতর্ক দৃষ্টিতে রাখা হলো। বাগানে বেশী যেতে দেওয়া হতো না। লেখাপড়া, ছবির বই ইত্যাদি দিয়ে তাকে আটকে রাখা হলো বটে, তাতে সে হাঁফিয়ে উঠতে লাগলো।

কিন্তু যত তার অস্বস্তি বাড়ছে ততই সতর্কতার অন্ত নেই। মাকে নাকি দত্তদের বাড়ীর দিদিমা বলেছে : তোমার মেয়ের গায়ে হাওয়া লেগেছে, ঝাড়াতে হবে। মেয়েকে বেশী গাছপালার কাছে যেতে দিও না।

মায়ের মন, শঙ্কা হবার কথাই, তাই বাঁধন আরো শক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু ফাঁক পেলেই রুমঝুম ফাঁকি দেয়, দুপুরে সবাই যখন দিবানিদ্রা দিচ্ছে বা স্কুল-কলেজে, অফিসে চলে গেছে—তখন সে বই শ্লেট ফেলে পা টিপে টিপে বাগানে যায়। শিউলিগুলি মাটিতে প'ড়ে শুকিয়ে গেছে—আবার তার উপর টাট্‌কা শিউলিরাও ম্লান হয়ে আসছে রৌদ্রের প্রখরতায়। চারিদিকের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখে রুমঝুম ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলে। শিউলি গাছ দু'টি তাদের চার পাঁচটি পাতা ঝরিয়ে দিয়ে যেন নীরব সান্ত্বনা দেয়। তার পর স্থুরু হয় তাদের কথাবার্তা।

পুরোদমে গল্প চলছে—এমন সময় রুমঝুমের পরোয়ানা এসে যায়ঃ এই রুমঝুম! জলদি, জলদি চলো, মা ডাকছে।

কতদিন রাতে রুমঝুম স্বপ্ন দেখেছে শিউলি গাছরা বলছেঃ "রুমঝুম, তুমি যদি আর না আসো, আমরাও বাঁচবো না, আমাদের সতেজ পাতা সব শুকিয়ে আসবে, হয়তো থাকবে শুকনো ডালগুলো, একদিন তা চাকরে কেটে পুড়িয়ে দেবে। সঙ্গী বা বন্ধু না থাকলে কেউ বাঁচতে পারে?"

রুমঝুম বলেঃ কি করবো ভাই, তোমাদের ছেড়ে আমিও কত দুঃখ পাচ্ছি কেউ বোঝে না। একবার গেলেই ধ'রে নিয়ে আসে। তোমরা ভাই, কষ্ট করোনা লক্ষ্মীটি। আমার নাকি অসুখ করেছে, অসুখ ভাল হ'লেই আমি আবার নিশ্চয় যাবো। আমিও তোমাদের সঙ্গে খেলতে না পেলে বাঁচবো না।

রুমঝুমের মনে হয়—শিউলি গাছরা যেন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে

যাচ্ছে, তাদের সাদা সতেজ ফুলগুলো কেমন মলিন হয়ে আসছে। চীৎকার ক'রে রুমঝুম ডাকে ঃ শিউলি, ও শিউলি ভাই!

মা পাশে ঘুমিয়ে ছিলেন, উঠে পড়েন তাড়াতাড়ি—ঘাট্ ঘাট্ ক'রে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। তন্দ্রার আচ্ছন্নতার মধ্যে রুমঝুম শোনে মা বাবাকে বলছেন ঃ তুমি কিছু বুঝছো না, এ দত্ত-গিন্নী যা বলেছে ঠিক তাই।

বাবা বললেন ঃ পাগল! ওকে আটকে রেখেই খারাপ করছো। ওর মার প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর—রুমঝুম শুনতে চায়না।

বাঁধন শক্ত হলো দৃঢ়ভাবে। ছাদ ছাড়া রুমঝুম কোথাও যেতে পায় না। একদিন তার অসুখ হলো। জ্বর, প্রবল জ্বরে রুমঝুম আবোল তাবোল বকছে, অসংলগ্ন কথা, তবে শিউলিদের সঙ্গে কথা, মাঝে মাঝে হেসে ওঠে রুমঝুম ঃ "পর অত ভাবছো কেন? আমার অসুখ সেরে গেলেই আমি যাবো তোমাদের কাছে। না, না, অমন শুকনো ফুল হয়ে যাচ্ছো কেন?"

একদিন রাঙাদি রুমঝুমের কাছে ব'সে আছে। রুমঝুমের জ্বরটা কম, রাঙাদি বললে ঃ কি চাইছিস? কি ইচ্ছে করছে রে?

ম্লানমুখে রুমঝুম চেয়ে রইলো।

—ফুল নিবি? ফুল?

ঘাড় নাড়লে রুমঝুম।

রাঙাদি তার ছোট্ট হাতটা ভর্ত্তি ক'রে এক রাশি শিউলি ফুল দিলো। রুমঝুম তাকালো ফুলগুলোর দিকে, ছড়িয়ে দিলে তাদের তার বিছানায়, তারপর পাশ ফিরে চোখ বুজলো।

ডাক্তার ব'লে গেছেন রোগ তাঁর চিকিৎসার বাইরে! মা চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদছেন, রাঙাদি মলিন মুখে শিয়রের কাছে ব'সে। ভাইবোনেরা সবাই নীরবে চোখ মুচছে। রুমঝুম সকলের ছোট, সকলের আদরের।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রুমঝুম আর জলও গিলতে পাচ্ছে না, কষ বেয়ে প'ড়ে গেল। রাঙাদি কেঁদে উঠল। বাবা এসে ধীরে ধীরে রুমঝুমের মাথায় হাত রেখে ডাকলেন ঃ রুমঝুম! মা-মণি! রুমঝুম চোখ মেললো, উদাস দৃষ্টি।

—বাগানে যাবে মা? বাবার আদর-ভরা কণ্ঠস্বর।

রুমঝুম বাবার দিকে চেয়ে রইল, কথা বলতে পারে না আর। কোন দিকে না দৃষ্টি দিয়ে বাবা তাঁর দুই সবল বাহু দিয়ে মেয়েকে চাদর জড়িয়ে তুলে নিলেন। কেউ কিছু বলার আগে—প্রবল শক্তিতে নেমে এলেন নীচে, সকলের বিস্মিত ও স্তম্ভিত দৃষ্টিকে আরো বিস্মিত ক'রে।

নীচে এসে দালান ঘর পার হয়ে বৈঠকখানা বাঁদিকে রেখে লম্বা সরু বাগান যাবার স্থানটিতে এসে ডাকলেন ঃ রুমঝুম, আমরা বাগানে যাচ্ছি।

তারপর কৃষ্ণকলি, স্থলপদ্ম, পঞ্চমুখী জবা গাছের সারি দ্রুতপদে পার হয়ে জোড়া শিউলি গাছের নীচে এসে দাঁড়ালেন।

রুমঝুম চোখ মেলে চাইলো। গাছ থেকে টুপটুপ ক'রে দু'টি শেফালি ঝ'রে পড়লো রুমঝুমের বুকে আর মুখে।

বাবা রুমঝুমকে শুইয়ে দিলেন জোড়া শিউলি গাছের নীচে।

ইতিমধ্যে বাড়ীর সবাই এসে জড় হয়ে গেছে। অন্তিম পথযাত্রী মেয়েকে নিয়ে এ কি কাণ্ড বাবার!

বাবা বললেন ঃ কেউ এখানে থাকবে না, সব বাড়ীর ভিতর যাও। বাবার তখনকার গম্ভীর আদেশ অমান্য করবে এমন সাহস কারো নেই। কেবল কাজল থাকবে, ও যে রুমঝুমের বন্ধু।

রুমঝুম শুয়ে আছে, মুখে যেন তৃপ্তির হাসি। ক্লান্ত উদাস দৃষ্টি যেন কমে এসেছে। মাথার কাছে কাজল, কান্নায় ভরা চোখ।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। আকাশের গায়ে দু'-চারটে তারা দেখা যাচ্ছে। বাগানের সমস্ত ফুলের মিষ্ট সুবাস—বাতাসকে ভারী ক'রে তুলছে।

অতি ক্ষীণস্বরে রুমঝুম ডাকলো ঃ বাবা!

—কি মা? বাবা উত্তর দিলেন ঝুঁকে প'ড়ে।

—আমায় এখানে আবার আসতে দেবে?

—হাঁ, মা-মণি—নিশ্চয়।

—শিউলি গাছে একবার হাতটা লাগিয়ে দাও না বাবা।

মেয়ের হাত দু'টি গাছে স্পর্শ করালেন বাবা। তার পর বললেন ঃ আজ চলো, আবার কাল আসবে, আমি নিয়ে আসবো কোলে ক'রে। রোজ, রোজ তুমি আসতে পাবে, কেউ বারণ করবে না।

রুমঝুমের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠলো।

বাবা আবার দু'হাতে মেয়েকে তুললেন। একটু গাছের নীচে দাঁড়ালেন। মনে হলো রুমঝুম তাই চায়। দু'টি পাতা ঝ'রে পড়লো রুমঝুমের গায়ে, পাতায় পাতায় কি যেন আওয়াজ, হয়তো বাতাসের

দোল। রুমঝুম দেখলো আকাশে তারা ফুটে উঠেছে, সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল তারাটা তার মাথার উপরেই। অস্ফুট কণ্ঠে সে বললেঃ ধন্যবাদ।

বাবা ঘরে ফিরে এলেন।

রুমঝুম ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠছে। ডাক্তার বললেন, আশ্চর্য রকম বেঁচেছে সে। এখন তাঁরা ভাবতে পারেন না কেমন ক'রে এ সম্ভব হলো।

রুমঝুম হেসে আস্তে আস্তে বললেঃ তাহ'লে আপনি ডাক্তারী করা ছেড়ে দিন ডাক্তার কাকা।

—তুমি তো মা তাই ছাড়াবে দেখছি। হেসে জবাব দেন ডাক্তারবাবু। বাবার নির্দেশে প্রতিদিন চেয়ারে ক'রে বিকেলে বাগানে নিয়ে যাওয়া হয় রুমঝুমকে—। ইজিচেয়ারে সেখানে সে শুয়ে থাকে, শিউলি গাছের নীচে। আবার তার হাসি কথা ফিরে আসছে। বাবা বলেছেন সে হাঁটতে পারলে—পড়ালেখার সময় ছাড়া সব সময় সে বাগানে খেলতে পাবে। রুমঝুমের এ কথা মনে আছে।

জোড়া গাছে অজস্র শিউলি ফুটছে। বাগানের মাটী দেখা যায় না।

ধীরে ধীরে জ্বলে জ্বলে

সেদিন কুমকুমের একেবারে পড়া হয়নি, তার মানে পড়া তৈরী করতে পারেনি। কেমন ক'রেই বা পারবে? একে তো রুণুদের দল এসে যা তাড়া লাগালো খেলতে যাবার জন্য, সেই জন্য ভালো ক'রে খাবার খাওয়াই হলো না। হালুয়া আর পাঁপর-ভাজা খেতে কতটুকুই বা সময় লাগে, কিন্তু তাও খেয়ে উঠতে পারলো না। খাবার জলের গেলাসে পাঁপর-ভাজা ডুবিয়ে যেই না খেতে গেছে, পড়বি তো পড়, একেবারে পিসির চোখে! পিসি একালের আধুনিকা মেয়ে হ'লে কি হবে, যা রাগী মেয়ে, বাবা! ওকে পড়বার সময় দেখলে আর পড়া হয় না। হবে কেমন ক'রে? বই হাতে দেখলেই ব'লে বসবে—কই দেখি কুমকুম, কেমন পড়া হয়েছে? ও-কথা শুনলেই অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে—না পারলেই বকুনি আর ঐ সব শব্দগুলো—যা শুনে-শুনে

কুমকুম মুখস্থ বলতে পারে : এ সব মেয়েদের কিছু হবে না। কেবল খেলা, নাচ, গান! কোথায় মিটিং হচ্ছে, স্কুল পালিয়ে চল সেখানে, আজ স্ট্রাইক, কাল এর ছুটি, হেন-তেন, একটা না একটা বুদ্ধি বেরুবেই। বড়দা যেমন কিছু বলে না! দেখবে কেমন মেয়ে হবে ··· ইত্যাদি।

কুমকুম ভাবে পিসি যে অত বলে, তা ওরা কি ছোটবেলায় গঙ্গার ঘাটের সাধুর মত চোখ বু'জে ব'সে থাকতো, না ঠাকুমার মত ঠাকুর-ঘরে মালা জপ করতো—তা করলে কেমন ক'রে পাস করলো আবার কলেজ থেকে? হঠাৎ কুমকুমের কানে আসে—ওর ছোটদা পিসিকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওকে বকুনি খাওয়াবার জন্য যেন পড়ছে : ABC ত্রিভুজের A বিন্দু হইতে BCর মধ্য-বিন্দু Dর উপর AD লম্ব টানা হইয়াছে। প্রমাণ করিতে হইবে যে—

কুমকুমের আরো বেশী রাগ হয়, জ্যামিতির ঐ ABC শুনলে তার গায়ে জ্বালা ধরে, ছোটদা জানে ব'লে বেশী ক'রে অমনি করে। তা ছাড়া গাধার মত চেঁচালে ওখানে পড়া যায় নাকি? এই কথা বলেছিল ব'লেই তো ছোটদা ওর বেণী ধ'রে টান মারলো! এত পাজী ছেলে, আর পিসি বলবে অলকের মত পড়াশুনোয় ভালো ছেলে দেখা যায় না, কুমিটা হচ্ছে ফাঁকিবাজ। এ কথা শুনলে কার না কান্না পায়? আবার সুন্দর নামটাকে কাট-ছাঁট ক'রে কুমি বলা হচ্ছে। ছোটদা তো শিখলেই যখন-তখন বলবে বন্ধুবান্ধবের সামনেই। মাকে ব'লেও তো ফল হলো না, বললেন : আচ্ছা, সবাই তোমায় কুমু বলবে, রবীন্দ্রনাথ এই নাম তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছিলেন—

ধুত্তোর রবীন্দ্রনাথ, কুমকুমের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে।

ওর অমন সুন্দর নামটাকে যা-তা করবে সবাই, অথচ অনুযোগ করলে কেউ আমোল দেয় না। সবচেয়ে রাগ তার পিসির উপর, অত যে সাধু সেজে বলা হয়, মিটিং, স্ট্রাইক—যেন নিজেরা কিছুই করেননি—এই সেদিন স্বকর্ণে কুমকুম শুনেছে, পিসির সেই বন্ধু অলকা সেনকে পিসি বলছেঃ তোর মনে পড়ে অলকা, স্কুল পালিয়ে প্রমীলাদের বাড়ীর ছাদে লুকোচুরি খেলা আর তেঁতুল খাওয়া? একদিন ছাদের আলসেতে নামা হয়েছিল আর পাশের বাড়ীর গিন্নী কাপড় তুলতে এসে চীৎকার করেছিল আমাদের দিকে চেয়ে?

অলকা সেনও তো বলছিলঃ মনে নেই আবার, সেদিন তো শুধু বকুনি নয়, মারও খেতে হয়েছিল—

তবে যে পিসি অমন ক'রে বলে, এবার একদিন স্পষ্ট কুমকুম ব'লে দেবে, তার পর মার খেতে হয় খাবে।

কিন্তু মুস্কিল তো ঐখানে, আজই রুণুরা এলো, আজই খেলতে যাবার জন্যে পাঁপরগুলো জলে ডুবিয়ে খাওয়া হলো, সবই আজ, আর পিসিই দেখলো—নাঃ, কুমকুম আর ভাবতে পারে না। পড়া ছেড়ে আস্তে-আস্তে শোবার ঘরের ভিতর ঢুকলো। ঘরের পিছন দিক্কার জানলাগুলোর কাছে একটা বড় গাছ ছিল, সেই গাছে থাকতো এক-ঘর শালিক। কর্তা, গিন্নী আর বাচ্চা-কাচ্চা। কুমকুম অনেক সময় লক্ষ্য করেছে ওরা কি বলাবলি করে, কিন্তু কিছু সে বুঝতে পারে না। আজ যেন কুমকুমের মনে হচ্ছে, ওরাই ওর বন্ধু, বকা-ঝকা করে না, কালো চোখ বা'র ক'রে মিটমিট ক'রে ওর দিকে তাকায়, আবার বন্ধ করে, মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে উ'ড়ে এ-ডাল ও-ডাল ক'রে বেড়ায়। খেলাধুলো না থাকলে কুমকুম এই সব দেখে।

গাছটাও মস্ত গাছ, ডালে-পাতায় ভরতি, একটুকু ফাঁক নেই। উপর-তলা নীচে-তলা হয়ে গেছে তিন-চার-তলা বাড়ীর মত। সব উপরের তলায় থাকে এক-ঘর চন্দনা, মাঝের তলার ভাড়াটে শালিক-পরিবার আর নীচের তলায় চড়াই-গিন্নী ছানা-পানা নিয়ে আরাম ক'রে বাস করে। তাদের খাবার-দাবার কুমকুমদের ভাঁড়ার থেকে যা আসে তাই যথেষ্ট—ইচ্ছা করলে কিছু বিলিয়ে দিতেও পারে। কিন্তু যে সুবিধাটা চড়াই-গিন্নী এই রেশন-এর দিনে পাচ্ছে, তা কিন্তু উপর-তলা বা মাঝের তলার ভাড়াটেরা পায় না। তা না পাক, তাদের খাবার সংগ্রহ করবার শক্তি আছে।

এই ঝাঁকড়া-মাথা গাছটার নীচে যদি দাঁড়ানো যায়, বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে নীল আকাশের একটুও দেখা পাবে না। খাটে শুয়ে কুমকুম কত রাতে ঘুম ভেঙে ভয় পেয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। সারাদিন ধ'রে দিনের আলোয় যে গাছকে দেখেছে, গভীর রাতে নিস্তব্ধ পৃথিবীতে তার যেন অন্য রূপ দেখে সে আতঙ্কিত হয়েছে।

তবু তিন তলার তিন-ঘর অধিবাসীদেরই সে চেনে। বেশী ভালো লাগে তার মাঝের তলার বাসিন্দাদের। তাদের বাসার সঙ্গে তাদের ঘর একেবারে এক সমান লাইনে। কুমকুম ভারী-মুখে জানলার রেলিং ধ'রে গাছের দিকে চেয়ে রইল।

শালিক-গিন্নীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল: দেখেছ, বাগচি-বাড়ীর মেয়েটা অভিমানে মুখ ফুলিয়ে রয়েছে।

কর্তা ঘাড় গুঁজে আরাম করছিল, বললে: দেখেছি বৈ কি,

বেচারার পড়া হয়নি আর ওদের বাড়ীর ছোট ছেলেটা গলা ফাটিয়ে পড়ছে, শুনছো না ?

—শুনছি বৈ কি ! আহা, একরত্তি দুধের মেয়ে, এত পড়ার চাপ দেওয়াই বা কেন ? ঐ ওর পিসিটা, উঁচু জুতো প'রে খট্‌খটিয়ে ছাতা হাতে ক'রে বেরোয়—ওই তো বেশী শাসন করে। শালিক-গিন্নী স্নেহভরে একবার কুমকুমের দিকে তাকালো।

কর্তা বললে ঃ কিন্তু যে বয়সের যা। এখন ছোট কিন্তু একদিন তো বড় হবে, চিরদিন ছোট থাকবে না, লেখা-পড়া তো করতেই হবে।

গিন্নী ঠোঁটটা একবার গাছের ডালে ঘষে নিলো, তার পর বললে ঃ তা তো বটেই—তবে বড় ছেলেমানুষ।

কর্তা বললে ঃ তা আর কি হবে বলো ? একটু-একটু ক'রে সব দিক্ দিয়ে বড় হবার চেষ্টা করা উচিত, আর এখন থেকেই—এই ছোট থেকেই।

গিন্নী আর একবার নরম চোখে তাকালো কুমকুমের দিকে, তার পর ব'লে উঠলো ঃ আহা, তা হোক, কচি বাচ্চা।

কর্তা রেগে বাধা দিয়ে বললে ঃ কচি বাচ্চা—কচি বাচ্চা ক'রে তুমি তোমার ছেলেমেয়েদেরও মাথা খেয়েছ, বিশেষ ক'রে বড় ছেলেটার।

—কেন কি করেছে সে ?

কর্তার মেজাজ তখনও সমান পর্দায় ঃ হয়েছে আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু !

গিন্নী কিছু বলবার আগে ছোট ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে তাদের কাছে এসে ডাকলো ঃ মা ! বাবা !

গিন্নী ব্যস্ত হয়ে বললেঃ কি হয়েছে রে, এত হাঁপাচ্ছিস কেন?

ছোটর সারা মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললেঃ অনেক—অ—নে—ক দূর উড়ে বেড়িয়ে এলাম। দিদি সঙ্গে ছিল। আকাশটা কোথায় শেষ হয়েছে কেবল তাই দেখতে ইচ্ছে করে।

গিন্নী ছোটর কাছে স'রে এসে বললেঃ ষাট ষাট, অত দূর যাস নে, বাপু।

কর্তা হুঙ্কার দিয়ে উঠলোঃ না যাবে না, তোমার কোলের কাছে ব'সে থাকবে?

—আচ্ছা, তুমি থামো, তোর দাদা কোথায় রে ছোট?

আবার কর্তার সপ্তমে-চড়া কণ্ঠ শোনা গেলঃ কোথায় আবার যাবে, বাসায় পড়ে-পড়ে ঘুমুচ্ছে, একটুও উড়তে পারে না, পোকা ধরতে পারে না—একবারে হাঁদা গঙ্গারাম—অমন ছেলে থাকার চেয়ে যাওয়া ভালো।

গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলোঃ বলি, বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে নাকি? ষাট, বাছা আমার বেঁচে থাক!

—বেঁচে থাকবে কি ক'রে? শক্তি চাই, বুঝলে গিন্নী! নির্জীব হয়ে পড়ে থাকলে এ যুগে বাঁচা চলবে না। উড়তে পারবি না, পোকা ধরতে পারবি না, তবে পাখী হয়ে জন্মেছিস কেন? মানুষের ঘরে জন্মালেই তো পারতিস!

—তা বেচারা পারে না কি হবে? গিন্নীর কথার সুরে অনুকম্পা।

—পারে না কেন শুনি? তার ছোট ভাই, ছোট বোন যখন আকাশের শেষ কোথায় দেখবার চেষ্টা করে, পোকা-মাকড় ধ'রে খায়,

তখন ধেড়ে ছেলে বাসায় খেয়ে প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমুচ্ছে, আর মা-বাপের হাত-তোলা খাচ্ছে, লজ্জা করে না—ছিঃ!

—তা কি করবে? বেচারার ডানায় জোর নেই।

—কে বললে জোর নেই? ভয়েই সারা, এ যুগে ঐ কুড়েমি আর ভয় থাকলে তোমার ছেলে ঐ বাসায় পচে মরবে, বুঝলে?

গিন্নী রেগে বললে: একশো বার ঐ ছাই কথাগুলো বোলো না বলছি।

ছোট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, এবার বলে উঠলো: আমারও এই রকম ভয় করতো, মনে হতো উড়তে পারবো না, ডানা ভেঙে প'ড়ে মরবো।

কর্তাও ব'লে উঠলো: হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছোটবেলায় আমারও অমনি হতো, সকলেরই হয়।

ছোট একদমে ব'লে চললো: চেষ্টা করতেই দেখলাম, বেশ উড়তে পাচ্ছি। আর সে কী মজা আর আনন্দ!

গিন্নী একটু ভেবে বললে: বড়কে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে বললে হয়।

কর্তা বিরক্ত হয়ে বললে: কিন্তু চেষ্টা ক'রে দেখবার কি মন আছে? মন থেকে ভয়কে মুছে ফেলতে না পারলে কোনো কালেই কিছু হবে না, শুধু বয়সই বাড়বে, বুদ্ধি আর পাকবে না। শোনো গিন্নী, বড়কে ওড়া শেখাতেই হবে, আজ কেউ ওকে খাবার দিতে যেয়ো না।

—বা রে, না খেয়ে থাকবে ছেলেটা? গিন্নীর কণ্ঠস্বর ভিজে।

—না, না, নিজের চেষ্টায় ও খাবার খুঁজে নিক, উড়তে শিখুক।

আত্মনির্ভরশীল হওয়া দরকার, শক্তি চাই। কর্তা জোর দিয়ে ব'লে উঠলো।

ছোট তার দিদির সঙ্গে আবার উড়ে চললো আকাশে। উড়তে উড়তে নীল আকাশের কোন্ অসীম শূন্যে তারা মিলিয়ে গেল ক্রমশঃ।

বাসায় শুয়ে বড় ঝিমুচ্ছিল—সে দেখলো ওরা উ'ড়ে গেল, নীচের তলায় চড়াই-গিন্নীর সে-দিনের কচি বাচ্চাটা পর্যন্ত তার আহার সংগ্রহের চেষ্টা করছে। উপর-তলা থেকে যে আসতো মাঝে মাঝে, কথা বলতো—চন্দনার সেই ভাইটাও পাখা মেলে উ'ড়ে গেল।

বড় দেখছে একমনে, একমাত্র সে-ই বাসায় পড়ে আছে অথর্বের মত।

মা ডাকলো ঃ বড় এসো, খাবার নাও।

বড় এগিয়ে আসার চেষ্টা করলো—কিন্তু পারলো না। মা আবার ডাকলো, বললে ঃ চেষ্টা করো বড়, ঠিক পারবে।

বড় ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলো ঃ না মা, প'ড়ে যাচ্ছি যে!

—একবার পড়বে, দু'বার পড়বে, তিন বারে ঠিক উড়তে পারবে।

বড় প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো। শালিক-গিন্নী তখনও বলছে ঃ নিজের শক্তি জাগাতে হবে, ওঠো বড়, ঠিক উড়তে পারবে।

কুমকুম তখনও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে হলো, তাদের সব কথা সে বুঝতে পেরেছে। ভারী আরাম আর আনন্দ হচ্ছিল তার। মনে হলো, সে-ও যদি ডানা মেলে অমনি অসীম শূন্যে উড়তে পারতো!

শালিক-গিন্নীর বড় ছেলে মাটীতে প'ড়ে গেছে, উড়তে চেষ্টা করছিল, পারেনি।

মা এসে ছেলের মুখে খাবার দিয়ে বললে : ঠিক উড়তে পারবে বড়, চেষ্টা করো, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। মনে রেখো, নিজের শক্তি জাগাতে হবে।

পিসির কণ্ঠ শোনা গেল : কুমকুম কই রে? পড়তে বসেনি?

ছোটদার উচ্চকণ্ঠ তখনও ঘোষণা করছে : ABC ত্রিভুজের A বিন্দু হইতে BCর মধ্য-বিন্দু Dর উপর লম্ব টানা হইয়াছে—

কুমকুম আর একবার নীল আকাশের দিকে চাইলো—দেখলো, শালিক-গিন্নীর বড় ছেলে উড়ে চলেছে···।

কুমকুমের কানে বাজতে লাগলো : মনে রেখো, নিজের শক্তি জাগাতে হবে···।

শিবু

তিন-চারটি ভাইবোনেদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট শিবু। সে যে কেন এমন হলো তা ভেবে পাওয়া যায় না। মার মনে ভয়ানক দুঃখ, বাবারও তাই, তবে তিনি পুরুষ মানুষ, প্রকাশ কম, কিন্তু ভালো ক'রে মুখের দিকে তাকালে মনের কথা কিছুটা বোঝা যায় বৈকি!

আর ক'টি ভাইবোন সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট, প্রাণবন্ত তারা। শিবু জন্মানোর পর দেখা গেল তার মুখের একদিকের চোখ, ভ্রূ ইত্যাদি সব আছে কিন্তু আর একদিকের চোখ, ভ্রূ বলতে কিছুই নেই, একেবারে প্লেন পাতলা চামড়ায় ঢাকা, কুঁচকে কুঁচকে আছে।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মায়ের দু'চোখ জলে ভ'রে এলো। যারা শিবুকে দেখতে এলো, মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে চ'লে গেল—মায়ের সামনে আর কিছু বললে না। বাবা এলেন—দেখি কী হয়েছে? তারপর মুখটা গম্ভীর ক'রে বললেন: দেখি কি করা যায়। ডাক্তার রায়কে খবর দিই।

বললেন কেবল বোস বাড়ীর জ্যাঠাইমা। বিরাট বিপুল দেহ, সচল একটি জুয়েলারী দোকান—তাঁর দিকে তাকালেই একথা মনে হয়।—কই গা বৌমা, দেখি নতুন খোকা, কি সব বলছে!

মা তো ভয়ে কাঠ। এই মহিলাকে তিনি সবচেয়ে দূরে রাখতে চান। একে তো মনোবেদনার শেষ নেই, তার উপর আবার একি শাস্তি!

তবুও তোয়ালে জড়ান শিবুকে বা'র ক'রে দেখাতেই হলো।

গালে হাত দিয়ে জ্যাঠাইমা বললেন ঃ ও আমার কপাল—এমনি ধারা ছেলে হলো?

মা চুপ ক'রে রইলেন।

শিবুর জন্মের শুভ শঙ্খধ্বনি এইভাবে দুঃখপূর্ণ ও বিকৃত হয়ে উঠলো।

শিবু ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগলো। ভাইবোন ছাড়া মা আর কারো সঙ্গে খেলতে দেন না, বাইরে যেতে দেন না। সতর্ক দৃষ্টি মায়ের সব সময় জাগ্রত।

শিবু তো নিজের কথা কিছুই বুঝতে পারে না। একটি চোখের দৃষ্টিতেই সে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। এই তার জন্মগত অভ্যাস, কাজেই সে তার বিকৃত অঙ্গের কিছুই বোঝে না। তার জন্মের কিছুদিন পরেই তার সম্পর্কে বাড়ীর আলোচনা থেমে, থিতিয়ে, জুড়িয়ে এসেছে, তাছাড়া মায়ের নিষেধও আছে—বরং ভাইবোন ও অন্য সকলে সচেতন হয়ে থাকে, নূতন কোনও লোক এলে তারা শিবুকে অন্য ঘরে নিয়ে যায় খেলতে।

শিবুর জন্য মাও বাইরে যাওয়া, আনন্দানুষ্ঠানে বা সামাজিকতায় যোগ দেওয়া সব ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর অন্য সব ছেলেমেয়েরা যাবে আর বিকৃত-অঙ্গ শিবু একা বাড়ী থাকবে, একথা ভাবলে তাঁর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠতো। তাই মা সব কিছুই ত্যাগ করেছেন শিবুর দিকে তাকিয়ে।

শিবু পাঁছ বছর পার হয়ে গেল।

পাঁচটা বছর পরে মায়ের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে শিবু একদিন তার বিকৃত দেহের কথা আবিষ্কার করলো।

সেদিন তখন ভাইবোনেদের স্কুলে যাবার সময়, খুব তাড়া, মাও রান্নাঘরে ব্যস্ত। ইবু আর নিবু স্নান সেরে চুল আঁচড়াতে দাঁড়ালো বাবার ঘরে বড় আয়নাটার সামনে। এই ঘরে আসবার লোভ তাদের বহুদিনের। এই ঘরে বাবা বেশী সময় থাকেন, কাজ করেন—কাজেই ছোটদের আসার হুকুম নেই। কদাচিৎ কোনও দরকারে মা হয়তো একবার আসেন। ঘরখানি দেখে আজ ইবু-নিবু বাবার আয়নাতে চুল আঁচড়াবার লোভ সামলাতে পারেনি। মহা আনন্দে দু'জনে চুল আঁচড়ে বেরিয়ে আসতে যাবে এমন সময় শিবু এসে বললে :

—আমি চুল আঁচড়াবো দাদাভাই!

শিবুর জন্য সকলের মনেই একটা বেদনা-বোধ ছিল—তাই তারা সকলেই তাকে ভালবাসতো। ওরা বললে : যা, চট ক'রে চুল আঁচড়ে চলে আয়,—বাবা এখনি এসে পড়বে।

মার কণ্ঠস্বর শোনা গেল : শীগগীর এসো ইবু-নিবু, খেতে দেওয়া হয়েছে।

ওরা দৌড়ে চ'লে গেল নীচে।

কিন্তু একি হলো! শিবু আয়নাতে ও কার মুখ দেখছে? ও কে? বিরাট আতঙ্কে যেন তার সারা শরীর হিম হয়ে আসছে। একটা ছোট মুখ—এক পাশে একটা ভ্রূর নীচে চোখ, মাঝখানে নাক—এ পাশে কিছু নেই, প্লেন হয়ে গেছে, পাতলা চামড়া কুঁচকে বিকৃত মুখের ভয়ঙ্করতা প্রকাশ পাচ্ছে।

শিবু ভয়ে ভয়ে হাত দু'খানা তুলে মুখটায় বুলিয়ে নিলে। হ্যাঁ, এটা তো তারই মুখ, স্পর্শটুকু বেশ অনুভব করতে পারছে। দাদা-দিদিদের মুখ তো এমন নয়—তাহ'লে তার মুখের এ ভয়ঙ্করতার কথা সে তো কোনদিন জানতে পারেনি—এ কী হলো!

বেদনায় নীল হয়ে গেছে শিবু, থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ব'সে পড়লো মাটীতে। তার এক চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

বাবা ঢুকলেন ঘরে—কিরে শিবু, এখানে কেন? কাঁদছিস কেন? শিবুর ছোট্ট বুকে তখন ঝড় চলেছে। হাত দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে আবার তার মনে হলো সেই বীভৎস দৃশ্যের কথা। আয়নার দিকে না তাকিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাবা খানিক সঙ্গে এসে চেঁচিয়ে মার উদ্দেশ্যে বললেন: দেখ তো শিবু কেন কাঁদছে।

মায়ের কাছে থেকে, ভাইবোনদের কাছে থেকে শিবু লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে থাকে। যখন তখন চেষ্টা করে বাবার ঘরে ঢুকে আয়নাতে মুখ দেখবার। বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ে খেলতে এলেই তাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে মুখে চোখে হাত বুলোয়। একদিন পাশের

বাড়ীর ছট্টুকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ তুই অনেক বেশী বেশী দেখতে পাস ছট্টু ?

ছট্টু ওর মুখের দিকে চেয়ে মানে বুঝতে না পেরে বললে ঃ তার মানে ?

—না, তাই বলছিলাম।

সেদিন ঘরে কেউ নেই, শিবু জানলার সার্সিতে চেষ্টা ক'রে নিজের মুখ দেখছে, এই মুখ যেন তার নিজের নয়—এ যেন এক ভয়ঙ্কর রকম জীব—যাকে দেখলে ভয়ে বুকের ভিতর ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

শিবুর কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে, চেতনা হারিয়ে ফেলছে যেন। এমন সময় নিবু ঘরে ঢুকলো ঃ কি করছিস রে ? মা খেতে ডাকছে যে !

—আচ্ছা দিদি, দুই চোখে বেশী দেখা যায় বুঝি ? যাদের এক চোখ—

নিবু বুঝতে পেরে বাধা দিলে, বললে ঃ ওসব থাক—আগে চল খেয়ে আসবি—তারপরে তোকে একটা মজার গল্প বলবো।

—না খাবো না, খেতে ইচ্ছে করছে না।

—কেন ? কেন ? দেখি তোর গা ? মায়ের মত সুরে নিবু বললে। গা'টা গরম মনে হলো যেন—নিবু বললে ঃ মাকে ডাকি।

—না, না, ডাকতে হবে না। তার চেয়ে তুই বল যা জিজ্ঞেস করছি।

—ওসব কথা বললে মা বকবে ভাই—তার চেয়ে গল্প করি আয়।

—আচ্ছা দিদি, তোর মুখটায় আমি হাত বুলিয়ে দিই—কেমন ?

নিবুর মনে খুব দুঃখ হচ্ছে—কিন্তু ছোট বিকৃত-অঙ্গ ভাইটাকে কি ব'লে বোঝাবে? তাই বললে: আচ্ছা দে।

শিবু নিবুর সারা মুখে হাত বোলাতে লাগলো—আর মাঝে মাঝে সার্সিতে নিজের মুখটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগলো। হঠাৎ ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো শিবু—দিদি আমার ভয়ানক শীত করছে। চাপা দিয়ে শুইয়ে দে।

নিবু ভাইকে তাড়াতাড়ি খাটে শুইয়ে দিয়ে গায়ে চাপা দিয়ে ডাকলো: মা, ওমা! শীগগির এসো।

মা এলেন: পরে বাবাও এলেন—ডাক্তারও এলেন। সারারাত্রি শিবু জ্বরের ঘোরে চমকে উঠেছে আর প্রলাপ বকেছে। মা বুকের কাছে টেনে বলেন: কেন এমন করছো—কি হয়েছে শিবু!

—সরে এসো না মা, তোমার মুখটায় একটু হাত দিই।

—এই তো আমি তোমার কাছে রয়েছি মাণিক!

আবার প্রলাপ স্থরু হলো: ওরে বাবা! কি ভয়ঙ্কর মুখ—ও কে? মা, ওমা! কাছে এসো; দু'টো চোখে কত বেশী দেখে মা?

ভোরের দিকে শিবু শান্ত হয়ে এলো দেখে বাবা শুতে গেলেন। মা ঘুমজড়ান চোখে শুয়ে রইলেন পাশে।

ভোরের আলো দেখা যেতেই বাবা ঢুকলেন ঘরে, দেখলেন শিবু স্থির নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, কোনও স্পন্দন নেই শরীরে তার, কেবল ছোট হাতখানি মায়ের মুখের উপর রাখা আছে।

ঠাকুর্দা

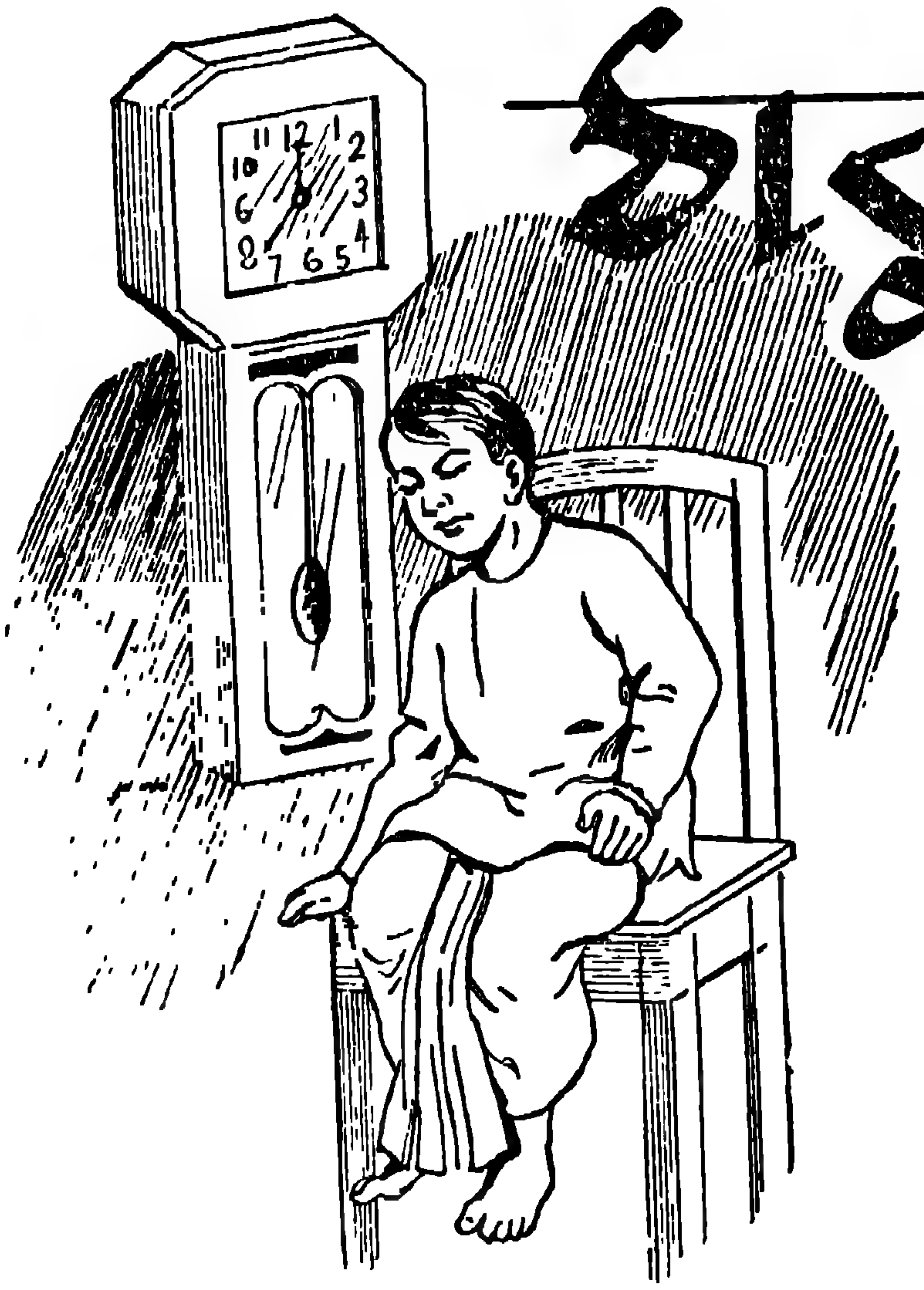

নিতু হবার পরই মা মারা গেলেন—আর তার কিছু দিন পরে বাবা। ব্যস, দেখবার লোক নেই। নিতু তো খুব ছোট্ট, ওর ক্ষুদে গিন্নী দিদি ইতু তখন পাকা পাঁচ বছরের। ভাবনাটা তাকেই ভাবতে হবে, কিন্তু সে বুঝতেই পারছিল না ব্যাপারটা কি হলো। ফুলের মত সুন্দর মা—একটা ছোট্ট হাত-পা-ওয়ালা পুতুলের মত ভাইকে উপহার দিয়ে সেই যে ঘুম-ঘুম চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে চুপ করলেন—আর কথা বললেন না। সকালে উঠে ইতু মাকে আর দেখতেই পেলে না। বাবা কোলে নিয়ে চুমা দিয়ে ছল ছল চোখে বললেন: ঐ যে মস্ত আকাশ দেখছো ইতু, তোমার মা ঐখানে, রাতে যে সবচেয়ে বড় আর জ্বলজ্বলে তারাটা দেখতে পাবে সেইটি তোমার মা।

—বাড়ীতে মা আর আসবে না বাবা?

—তোমরা যখন বড় হয়ে উঠবে, মা তখন ফিরে আসবেন।

—তাহ'লে আমাদের খেতে দেবে কে? কোলে নিয়ে আদর করবে কে? ঐ পুতুলটাকে নিয়ে খেলবে কে?

—সব আমি ক'রে দেবো মা-মণি,—যাও খেলগে।

ইতু কিছুই বোঝে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয়, মায়ের কাপড়গুলো তখনও আলনায় সাজানো, ড্রেসিং টেবিলে মায়ের চুলের রূপোর কাঁটাগুলো, সিল্কের ফিতে, সিঁদুর-কৌটা, চিরুনি সব পড়ে আছে। শোবার ঘরে খাটে মায়ের জায়গা খালি—কেমন যেন ফাঁকা আর বিচ্ছিরী লাগে ইতুর। সন্ধ্যা হলেই তার ঘুম পায় কিন্তু মায়ের গরম কোলে শুয়ে পড়াও যায় না, মাথায় হাত বুলিয়েও কেউ দেয় না। বাবা খাটে শুইয়ে দিয়ে কাছে বসে থাকে। পাশের ছোট্ট খাটখানায় —মায়ের শেষ উপহার পুতুলটি অঘোরে ঘুমোয়, কখনও কখনও চেঁচায়, বাবা ঝিকে ডেকে কাপড়-জামা বদলিয়ে দিতে বলেন। ইতু রোজ মনে করে আকাশ ভ'রে তারা উঠলেই বড় জ্বলজ্বলে তারাটাকে সে ডেকে বলবেঃ "শীগগির এসো, রাতে ভয় করে আমার, খেয়ে পেট ভরে না—সব কেমন বিচ্ছিরী হয়ে গেছে।" কিন্তু তারা উঠবার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভেঙে দেখে সূর্যিমামার আলোয় ঘর ভ'রে গেছে। ইতুর ভারী দুঃখ হয়। বড় তারাটাকে কিছুতেই সে আর দেখতে পায় না।

এমনি ক'রে কিছু দিন কেটে গেল। নিতু এখন বড় হয়েছে, বসতে শিখেছে, হাসে, খেলে। দিদিকে সে খুব চিনেছে, দিদি যখন তাকে অনভ্যস্ত হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে, সে দিদির নাকটা মাড়ী আর জিব দিয়ে চেপে ধরে, হাসে। বাবা কোলে নিতে চাইলেও যায় না। মায়ের পুরানো ঝি, সে না কি মার বাবার বাড়ী থেকে এসেছিল—সেই 'মাসী' ইতু আর নিতুকে দেখা শোনা করতো, খু-উ-ব ভালো-বাসতো।

নিতু সবে হাঁটতে শিখেছে—সেই সময় একদিন দু'-তিন দিনের

অসুখে বাবাও চলে গেলেন। ইতু ভেবে পায় না বাবা আবার কোথায় গেল। লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে ইতুরও একদিন জ্বর এসে গেল। মাসী ইতুর কথা বুঝতে পারে, বলেঃ তোমরা বড় হ'লেই বাবা, মা দু'জনেই ফিরে আসবে। ইতু কি বোঝে সেই জানে, তবে ভাইকে সে খুব ভালবাসে, মাসীকেও।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ইতু আর নিতু দু'জনেই এখন স্কুল যায়। কিন্তু হ'লে কি হবে—এর মধ্যে কিছু দিন ধ'রে একটা লোক তাদের বাড়ী আনাগোনা করতো, মাসীকে খুব শাসাতো—কি সব বলতো ইতু বুঝতে পারতো না—মাসী বলতো আমি ওসব কখনও পারবো না। লোকটা মাসীকে ধমকাতো, বকতো, তার পর চ'লে যেতো।

মাসীর কাছে ইতু শুনেছিল, ও নাকি কাকা হয় ইতুদের। বাবা থাকতে কিন্তু ইতু ঐ লোকটাকে দেখেনি। তাই ইতু লোকটাকে একেবারে দেখতে পারে না। সে এলেই ও নিতুকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়। কিন্তু ইতু দেখতে পায় ক্রমশঃ তাদের বাড়ীর ভালো ভালো জিনিষগুলো সব সেই লোকটা নিয়ে যাচ্ছে। বাবার চমৎকার মোটরটাই সে একদিন নিয়ে চ'লে গেল। বাড়ীর কত ভালো জিনিষ একটা একটা ক'রে চ'লে যাচ্ছে, সবই তার বাবা-মা'র জিনিষ। মাসীকে বললে মাসী কাঁদে আর তাদের বুকে চেপে ধ'রে আদর করে। মাসীর কান্না দেখে ইতু আর কিছু বলে না। শোবার ঘরের পাশের ঘরে যে প্রকাণ্ড বড় ঘড়িটা আছে—লম্বায় প্রায় ইতুর তিন ডবল—কি মিষ্টি আওয়াজ ক'রে সময় দেয়। সেই ঘড়িটার জন্য ইতুর ভারি ভাবনা হয়—সে ভাবে যদি এটা সেই লোকটা নিয়ে যায়—

এটাকে সে কিছুতেই দেবে না, ইতুর বেশ মনে আছে—বাবা বলতেন ঃ বুঝলে ইতুমণি, এটা হচ্ছে লক্ষ্মী ঘড়ি, আমার ঠাকুর্দা আমায় দিয়েছিলেন—আমি তখন তোমার চেয়ে আর একটু বড়, আমার ঠাকুর্দা খুব বড়লোক ছিলেন আর আমায় খুব ভালবাসতেন। আমি তাই এই ঘড়িটাকে 'ঠাকুর্দা' বলি—

—আচ্ছা বাপি, তোমার ঠাকুর্দা তোমায় গল্প বলতে পারে না? ইতু বলতো।

—খু-উ-ব খুব, ওর কি মিষ্টি আওয়াজ বলতো, ঐতেই তো ও কত কথা ব'লে দেয়।

—ও তোমায় খুব ভালবাসে বাপি?

—খুব, তোমাকেও বাসে, ঠাকুর্দা কি না।

—অত বড় কেন বাপি? কি লম্বা, আমার দেখলে মনে হয়—লোক দাঁড়িয়ে আছে।

—ঐ যে বল্‌লুম—ঠাকুর্দা বড় তো হবেই।

বাবার এই সব কথা ইতুর খুব মনে হয়। রাতে শুয়ে ভাইকে বলে ঃ বুঝলি নিতু, এই ঠাকুর্দা আমাদের খুব ভালবাসে, বাবা বলতো ঠাকুর্দা গল্প বলতে পারে, আর সব কথা ব'লে দিতে পারে।

—তোর চেয়ে, মাসীর চেয়েও ঠাকুর্দা ভালো দিদু?

—হ্যাঁরে, ও-যে অনেক বড়।

এমনি ক'রে ছোট্ট ভাই আর বোনের দিন কাটে। নিতু রোজ একবার ক'রে সেই বড় আর সোনার মত হাত-পা-ওয়ালা ঘড়ীর কাছে যায়, কেউ না থাকলে চেয়ার দিয়ে ওঠে, তার গায়ে হাত দিয়ে বলে ঃ বুঝলে দাদু, আজ কি হয়েছে?…দিনের সব খবর নিতু ঘড়ীর কাছে

গিয়ে ব'লে আসে। ইতু মাঝে মাঝে দেখতে পায় কিন্তু তারও বিশ্বাস ঠাকুর্দা থাকলে ঐ লোকটা বা অন্য কিছুর ভয় নেই।

আবার এক দিন লোকটা এসে নিতুর ছোট গাড়ীটা আর বাবার ভালো ভালো জিনিষ নিয়ে গেল। ইতুর ভারি দুঃখ হচ্ছিল—নিতুকে সে কি বলবে?

মাসীও খুব কাঁদছে। লোকটি চ'লে যেতেই নিতু ছুটতে ছুটতে এসে মাসীর গলা জড়িয়ে ধরলো: আবার সেই লোকটি এসেছিল মাসী, তুমি ওকে মেরে তাড়িয়ে দাও না কেন, ওকে দেখলে আমার এত ভয় করে কি বলবো, একি তুমি কাঁদছো কেন মাসী? কি হয়েছে রে দিদু?

—নিতু লক্ষ্মীছেলে ভাই, তুমি দুঃখ করো না, তোমার গাড়ীটা নিয়ে গেছে ঐ লোকটা, ওর না কি তোমার মত একটা ছেলে আছে।

—ইস্ কেন নেবে? মেরে হাড় ভেঙে দেবো না?

—অমন বলতে নেই ভাই, তুমি বড় হ'লে আবার আমরা নতুন গাড়ী কিনে আনবো, মাসী বলেছে। ইতু বলে।

নিতু একটু চুপ ক'রে থেকে ছুটে চ'লে যায় ঘড়ীটার কাছে, বলে: জানো দাদু, আমার গাড়ীটা নিয়ে চ'লে গেছে, তুমি ওকে কিছু বলবে না?

নিতুর কথা শেষ হতেই টিং টিং ক'রে ঘড়ীটা বেজে উঠে সময় দেয়। নিতু ভাবে দাদু তাহ'লে সব শুনেছে, নিশ্চয়ই তাহ'লে গাড়ীটা দাদু এনে দেবে।

রাতে শোবার সময় নিতু চেয়ার দিয়ে উঠে ঘড়ীটার গায়ে হাত দিয়ে বললে: ভুলে যেও না যেন, বুঝলে দাদু? গাড়ীটা আমার চাই।

নিতু দেখে ঘড়ীর বড় কাঁটা দু'টো যেন চিক্‌চিক্ ক'রে উঠলো। নিতু ভাবে দাদু তাহ'লে সব কথাই শুনেছে।

এক এক ক'রে ইতুদের সব জিনিষই চলে গেল। মাসী কোন ব্যবস্থাই করতে পারে না, খুব ঝগড়া করে লোকটার সঙ্গে, পাড়ার লোকদের বলে—কিন্তু তারা কি করবে, তারা তো পাড়ার লোক—আর এ হচ্ছে সম্পর্কে কাকা। তবু সকলেই খুব দুঃখ পায় ইতু আর নিতুর জন্য, আহা কত বড়লোকের ছেলেমেয়ে!

স্কুল থেকে এসে নিতু দেখে টম নেই, তার অত সাধের লোম-ওয়ালা সাদা কুকুর টম। নিতু বই-পত্তর ফেলে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উপরে উ'ঠে ঘড়িটার কাছে গেল: তুমি এখনও কিছু বলবে না দাদু? ···বলতে বলতে নিতু ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললে।

মাসী খাবার দিতে এসে দেখে ঘড়ির নীচে মাথা রেখে নিতু ফোঁপাচ্ছে আর ঘড়িটা ধীরে ধীরে টিক্ টিক্ শব্দ ক'রে যাচ্ছে, ঘরটি নিস্তব্ধ।

কিছুক্ষণ পরে মাসী নিতুকে ডাকে: চলো লক্ষ্মী, খাবে চলো, তোমার দাদু আমায় বলেছে নিতু বড় হ'লে সব এনে দেবো।

—দাদু বলেছে? কবে? নিতু লাফিয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বলেছে, তোমাকেও বলবে বলেছে। সেদিন রাতে খেতে যাবার আগে নিতু আগে উপরে এসে ঘড়িটার কাছে গিয়ে বলে: দাদু, লক্ষ্মী সোনা ভাই, ঐ দুষ্টু লোকটাকে একটু বকুনি দিয়ে দিয়ো—। আজ আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে তোমায় তো সব বলা হলো না, তোমার উপর রাগও হচ্ছে, কই তুমি তো এক দিনও গল্প বলো না—। নিতু হাই তুলে চেয়ারটা ছেড়ে বিছানায় চলে গেল। ··

নিতু অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে দেখছে, ভাবছে দাহুর সঙ্গে আর কথা কইবে না—কিন্তু ও কি ? ঘড়িটার বড় কাঁটা দু'টো যেন দু'খানা হয়ে গেছে···ও মা ! ধবধবে সাদা পোষাক-পরা দাড়িওয়ালা একটা লোক নেমে আসছে দেখো—দিদি, দিদি কোথায় গেল— ? কী সুন্দর চেহারা !

লোকটি ধীরে ধীরে নিতুর মাথায় হাত দিয়ে ডাকলো ঃ নিতু !

—কে তুমি ? তোমায় তো চিনি না। ভয়ে ভয়ে নিতু উত্তর দেয়।

—বা রে, রোজ তুমি আমার সঙ্গে কত কথা বলো—আর এখন বলছো চেন না ? আমি—

—ওহোঃ তুমি বুঝি দাহু ?

—হ্যাঁ ভাই।

—আচ্ছা দাহু, তুমি তো আমার একটা কথারও জবাব দাও না ; কেন ? আমার ভীষণ রাগ হয়।

—বা রে, আমি তো তোমার কথার জবাব দিই, তুমিই শুনতে পাও না তাই বলো।

—তবে তুমি ঐ লোকটাকে ব'কে দাও না কেন ?

দাহু নিরুত্তর।

—চুপ ক'রে রইলে যে ? দেখতে পাও না, দিদি কেমন মুখ ক'রে থাকে, মাসী কাঁদে।

দাহু তবুও নিরুত্তর।

—বলবে না বুঝি ? আচ্ছা বেশ না বলোগে, আমি আর কিছু বলবো না।

দু'জনেই চুপচাপ। একটু পরে নিতু ব'লে উঠলো ঃ আচ্ছা দাদু, তুমি গল্প জানো? মজার মজার গল্প?

—হ্যাঁ, জানি বৈ কি!

—বলো না দাদু ভাই!

দাদুর মুখের গল্প শুনতে শুনতে নিতু সব ভুলে গেল।

সকালে চোখ মুছে নিতু বলছে ঃ জানিস দিদি—

—কি রে? ইতু বললে।

—না থাক, পরে শুনিস্। দাদুকে জিজ্ঞাসা ক'রে বলবো। আমি একটা নতুন মজার গল্প শুনেছি।

নিতু বেশীক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারে না, সব ব'লে ফেলে।

—দূর, ও স্বপ্ন। ইতু বলে।

—কখনও না, আমি জানি—।

—আচ্ছা বেশ বেশ, ইতু বাধা দিয়ে ব'লে ওঠে।

কিন্তু স্বপ্ন বা সত্যি যাই হোক—নিতু নিয়ম-মত রোজই দাদুর কাছে সব বলতো, মাঝে মাঝে সে যেন দাদুকে দেখতেও পেতো। সত্যি আর মিথ্যে যাই-ই হোক।

আর অবশিষ্ট কিছুই নেই, নিতুদের জামা কাপড় পর্যন্ত কমে গেছে। ভাল খাবার দিতে না পারায় মাসী রোজ কাঁদে আর সেই লোকটার উদ্দেশে কত কি বলে। ইতু ভাবে এবার কি হবে? নিতু ভাবে সব যাক, যেন ঠাকুর্দাকে না নিয়ে যায়। এক দিন ঘড়ীটার দিকে চেয়ে লোকটা বলছিল ঃ বাঃ! চমৎকার ঘড়ী তো। নিতুর দৃঢ় বিশ্বাস ঠাকুর্দা এক দিন সব ঠিক ক'রে দেবে। ভাল খাওয়া আর ভাল জামা-কাপড় নাই বা হলো।

রাতে শুয়ে নিতু শুনলো মাসী বলছে দিদিকে ঃ কি যে হবে, কাল না কি ঐ ঘড়িটাকে নিয়ে যাবে, মিস্ত্রী ডাকিয়ে। ঘড়িটা গেলে ছেলেটাকে বাঁচানো যাবে না ইতু—কি করবো, ভগবানকে এত ডাকছি।

ইতু কিছুতেই উত্তর দেয় না, কি-ই বা দেবার আছে, ভেবেও পায় না কি বলবে।

মাসী আর দিহু ঘুমিয়ে পড়লো ঃ নিতু পা টিপে টিপে ঘড়ীর কাছে গেল ঃ একটা চেয়ার এনে তার উপর উঠতে লাগলো, উঃ কী ভীষণ অন্ধকার! তবু মনে সাহস এনে ভাবলে ঃ আমি তো পুরুষ মানুষ, আমার আবার ভয় কি ?

ঘড়ির গায়ে হাত দিয়ে নিতু বললে ঃ শুনলে তো দাহু, কাল তুমি চলে যাবে ? আচ্ছা যাও, আমি তোমায় আর কিছু বলবো না, আজ শেষ এসেছি। ঘড়িটার গায়ে মাথা রেখে নিতু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। অন্ধকারে ঘড়ির বড় কাঁটা তুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এত উজ্জ্বল—টিক্ টিক্ ক'রে আওয়াজ হচ্ছে—কি মিষ্টি যে লাগে নিতুর।

রাত বোধ হয় অনেক হয়ে গেছে, নিতু এবার উঠলো, চেয়ারে সটান হ'য়ে উ'ঠে দাঁড়িয়ে ঘড়ীর দরজাটা খুলে দেখতে লাগলো, এত মিষ্টি আওয়াজ কেমন ক'রে হয় ? মনে হলো ঠাকুর্দা বলছে ঃ নিতু ভাই, মন খারাপ করো না ঃ তোমাদের আমি খুব ভালবাসি। নিতু তৎক্ষণাৎ ঠোঁট ফুলিয়ে উত্তর দেয় ঃ তাই তো, কাল চলে যাবে ? ঠাকুর্দা বলছে ঃ পাগল, তোমাদের ছেড়ে কোথায় যাবো ?

—হ্যাঁ, মাসী তো দিহুকে বলছিল আমি শুনেছি।

—আচ্ছা শোনো, সত্যি আমি যাবো না। গল্প শুনবে নিতু ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ব্যস নিতুর রাগ জল হয়ে গেছে।

ঠাকুর্দা তখন গল্প বলতে সুরু করেছে : তার পর সেই রাজপুত্তুর চলেছে রাক্ষসকে মারতে, অনাহার পরিশ্রম তুচ্ছ ক'রে ছোট্ট ছেলে পক্ষিরাজকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।...এত কষ্ট করতে পারো নিতু ?...

—তার পর দাদু, তার পর ?

তার পর ? দাদু বলতে সুরু করলো...

—ভীষণ ঘুম পাচ্ছে দাদু, কিন্তু তুমি কাল যাবে না ঠিক তো ?

—আচ্ছা নিতু, আমার ডানদিকের পকেটে হাত দিতে পারো ?

—তুমি যা লম্বা, তাহ'লে চেয়ার দিয়ে ছুঁতে হয়—

—তুমি পার কি না তাই বলো না, ডানদিকের পকেট—

—নিতু ! নিতু !! মাসীর কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল।

নিতু পাশের ঘরে চেয়ারের উপর শুয়ে ঘড়ির গায়ে মাথা দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।......

—দিদি ! দাদু বলছে আমার ডানদিকের পকেটে হাত দিতে পারো ?

—সে আবার কি নিতু, তোর এমন সব কথা।

—হ্যাঁ দিদি সত্যি, আচ্ছা আয় আমার সঙ্গে—।

নিতু একটা ছোট চৌকির উপর চেয়ার দিয়ে উঠলো : বাঃ ! এবার তো ঠাকুর্দার গায়ে হাত গেছে। ধীরে ধীরে নিতু দরজাটা খুলে ডানদিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল—ঠিক সেই সময় ঢং ঢং ক'রে আটটা বাজলো আর ঘড়ীর কাঁটাগুলো যেন অস্বাভাবিক ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

নিতুর হাতে অনেক কাগজ-পত্র, আর কিছু নেই।

ইতু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—সকাল বেলা খাবার না খেয়ে কি হচ্ছে সব? এসো ইতু, নিতু, খাবে এসো। মাসী এসে ডাক দিলো।

—নিতু তখনও কাগজগুলো হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই নিরুত্তর।

—কি হয়েছে? ইতু?

—এগুলো ঠাকুর্দা দিয়েছে মাসী! নিতু হাত বাড়িয়ে মাসীকে দিলো।

ইতু আর নিতু এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, তোমাদের মত। ঠাকুর্দা যে কাগজগুলো দিয়েছিল তা তাদের ঠাকুর্দার সম্পত্তির উইল ইত্যাদি।

সেই বিচ্ছিরী লোকটি যা নিয়ে গিয়েছিল কড়ায় গণ্ডায় তাকে তা ফেরৎ দিতে হয়েছে। ওদের আর কিছু কষ্ট নেই। নিতুর সবচেয়ে আনন্দ তার গাড়ী আর টম ফিরে এসেছে। গাড়ীটায় নিতু আর চড়ে না—বড় হয়ে গেছে কি না, কিন্তু টমকে নিয়ে সে রোজ বেড়াতে যায়। ঠাকুর্দাকে সে আজও ভোলেনি। এখনও রোজ শোবার সময় একবার ক'রে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে আসে।

ছায়া

ভট্টাচার্যিদের মস্ত ঠাকুর-দালানটা এখন খালি প'ড়ে আছে—খাঁ খাঁ করে। ওদের অত বড় বিরাট পরিবার সব ছড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে গেছে। কেউ গেছে বিদেশে, কেউ সহরে,—তা ছাড়া অনেকের অকালমৃত্যু ঘটেছে। অত বড় বিরাট পরিবারে একমাত্র ছোট তরফের একটি মাত্র ছেলে—ঐ আধভাঙা বাড়ীতে আসর জাগিয়ে আছে। আগের দিনের সে দীপ্তি নেই, না আছে ভিতর-বাহির মহলের সেই গম্‌গমে ভাব—সেই জাঁকজমক, ঝাড়লণ্ঠনের আলো জ্বালা—কিছুই নেই। প্রতি-বার পূজোয় সাতখানা গ্রাম নিমন্ত্রিত হয়ে আসতো এই হরিশ ভট্টাচার্যিদের বাড়ী। সে কি বিরাট ব্যাপার—আমোদ-আহ্লাদ, খাওয়া-দাওয়া, বাজনা-বাদ্যি—কোলকাতা থেকে যাত্রা-থিয়েটার সব আসতো। সাত দিন শুধু কাঙালীভোজন। তা ছাড়া তাদের বাড়ীর

সাধারণ জীবনযাত্রাও একটা ছোটখাট পূজার মত। লোকজনের হাঁকডাকে বাড়ীটা যেন জীবন্ত হয়ে থাকতো।

সেই বাড়ী এখন নিঝুম—নিস্তব্ধ। পূর্বদিকের অংশে তিন-চারটে ঘর নিয়ে বাস করে ছোট তরফের এক বংশধর—অত বড় বাড়ীর একাংশে সে যেন টিম টিম করছে। অত বড় বাড়ীর জাঁকজমক বজায় রাখার মত সামর্থ্য নেই—নিতান্ত সাধারণ জীবনযাত্রা।

দেবল এই ছোট তরফের বংশধর। লোকের মুখে সে পূর্ব-পুরুষের কত গল্পই না শুনেছে—মায়ের কাছেও কিছু কিছু শুনেছে—তবু মা যখন এ বাড়ীতে বধূবেশে এসেছিলেন তখন এ বাড়ীর ভাঙন ধরেছে। বিরাট ঠাকুর-দালানটার ফাটলগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেবল তার পূর্বপুরুষের সুখ-সৌভাগ্যের কথা ভাবতো—কেমন ক'রে যে সব বদলে গেল দেবলের কচি ছোট্ট মনে কিছুতেই সে চিন্তা রূপ পেতো না। রাশভারী ঠাকুরদার বাবা অর্থাৎ দেবলের প্রপিতামহের যে প্রকাণ্ড ছবিখানা বৈঠকখানার দেওয়াল জুড়ে টাঙানো আছে, মাকড়সা যাতে নির্বিঘ্নে জাল বু'নে চলেছে, তার পাশেই তার পিতা-মহের ফটো—সেখানা দেখলে অত ভয় হয় না। বাবার চেহারাটা এদের পাশে মানায় না মোটে। বাবার কেমন হাল্‌কা চেহারা আর কথা। তাই বাবাকে সব কথা বলা যায়। কিন্তু কেমন ক'রে এমন হলো—দেবল সে কথা ভেবেই পায় না। এদিকের ঘরে তো কেউ আসে না—কেবল যখন সন্ধ্যা নামে, মা মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে আস্তে আস্তে বাহির বাড়ীর ঠাকুর-দালানে এসে একটা প্রদীপ জ্বেলে আর ধূনো দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে যান। মা এত ছোট্ট—ঠাকুর-দালানে মাকে একেবারে মানায় না। কিন্তু ছোট্ট হ'লে কি হবে—মা যখন

শাঁখে ফুঁ দেন তখন মায়ের শক্তির পরিচয় পায় দেবল। সারা গ্রাম-টায় মায়ের শঙ্খধ্বনির প্রতিধ্বনি হয়। মা গলায় কাপড় দিয়ে ঠাকুর-দালানে নত হয়ে প্রণাম করেন, তারপর আবার ভিতরে চ'লে যান। অত বড় ঠাকুর-দালানে ছোট একটা পিলসুজের উপর ছোট্ট পিদীমটা ধুক ধুক ক'রে জ্বলে। এই দৃশ্য দেবল প্রতিদিনই দেখে। সকালে দুপুরে দেবল এই ঠাকুর-দালানের কাছে খেলা করে। এখানটা তার ভারী পছন্দ।

ঠাকুর-দালানের মোটা থামের ভিতর দেবল তার পূর্বপুরুষের রূপকথা অন্বেষণ ক'রে বেড়ায়।

দালানের কার্নিশে অনেকগুলি পায়রা বংশপরম্পরায় বাস ক'রে আসছে—তাদের বিরাট পরিবার। মা'র কাছে শুনেছে পায়রারা নাকি বরাবর ছিল—কম আর বেশী, তবে বাইরের কার্নিশে ওদের থাকবার জন্য কাঠের ঘর ক'রে দেওয়া হয়েছিল দেওয়ালে—এখন সে সব ভেঙেচুরে গেছে। কেই বা দেখছে ওদের—তাই ওরা ঠাকুর-দালানের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে—সেইখানেই তাদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে।

দেবল তাই ওদের সব সময় নিরীক্ষণ করতো। ওদের পূর্বপুরুষও এইখানে বড় হয়েছে, এই দালানে উড়ে বেড়িয়েছে, ভট্টাচার্যি বাড়ীর সব সুখ-ঐশ্বর্য দেখেছে, সমারোহের পরিচয় পেয়েছে। দেবল ভাবে ঃ ওরা যদি কথা বলতে পারতো—ঐ দল বেঁধে উ'ড়ে যাওয়ার পত্‌ পত্‌ শব্দের মধ্যে দিয়ে ওরা যদি দেবলের ডাক শুনতে পেতো তাহ'লে দেবল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিতো—তার ঠাকুরদার কথা, ঠাকুরদার বাবার কথা। ছবি দেখে তার কেমন ভয় ভয় করে—কিন্তু

কেমন ছিলেন তাঁরা—কেমন ছিলো এ বাড়ী— কেনই বা সব তাদের চ'লে গেল,—সেই সব গল্প শুনতে ইচ্ছা করে দেবলের।

কিন্তু পায়রারা ঝাঁক বেঁধে উ'ড়ে চলে, আবার তারা ফেরে, সারা কার্নিশে ঘু'রে বেড়ায়, ছাদের আল্‌সেতে উ'ড়ে গিয়ে বসে, মুখে বক্ বক্‌ম শব্দ ক'রে মনের কথা ব'লে যায়।

প্রতিদিন দেখে দেখে দেবল ওদের জীবনযাত্রার প্রণালী মুখস্থ ক'রে ফেলেছে। ওদের বিরাট পরিবার—তবে ছড়িয়ে থাকে। পাশের বাড়ীর জ্যাঠাইমা যে দিন আধ মণ মুগ ছাদে রোদে দিয়েছিলেন সে দিন যেন এদের পরিবারের সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল। এটা কিন্তু ভালো লাগে না দেবলের। ওরা রোদে দিয়েছে ব'লে গোষ্ঠীবর্গ মিলে খেতে যেতে হবে—এ ভারী অন্যায়! কেমন বক্ বক্‌ম ক'রে ডেকে নিয়ে যাওয়া সবাইকে! কেবল এদের বুড়ী ঠাকুরমা আর যায় নি। ওরা কার্নিশের খাঁজের মধ্যে ঢুকে ব'সে থাকে, মাঝে মাঝে কি যেন বলে আবার চুপ হয়ে যায়।

দেবল ভাবে কি করে ওরা ওখানে!

সেদিন দেবল দেখলে একটা পায়রার ডিম ভেঙে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে ঠাকুর-দালানে ওঠবার সিঁড়িতে,—আর তারই ওপরের কার্নিশে ব'সে পায়রা-মা জোরে জোরে বক্ বক্‌ম করছে। সবাইকে জানাচ্ছে তার তিনটে ডিমের ভিতর একটা প'ড়ে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু মুখে সে যাই বলুক, বাকী ডিম দুটোর উপর সে নিজের সারা শরীর দিয়ে ঢেকে গরম রেখেছে, তা ফুটবে ফুটবে আর কি!

বেচারী পায়রা-মা! একটা বাচ্চা তার নষ্ট হলো। দেবল সেই

দিকে তাকিয়ে ভাবছে, একটা মোটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। বড় বৈঠকখানার ঘরটা তার সামনে কোণাকুণি ভাবে পড়েছে, জানলার একটা অংশ দিয়ে ঠাকুরদা ও তাঁর বাবার সেই মস্ত ছবি দুখানার কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। ঐ বড় ছবি দু'খানা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে দেবলের কাছে। দেবল একবার পায়রা-মা'র করুণ কণ্ঠের শব্দ শোনে—আর মাঝে মাঝে ফি'রে তাকায় সেই জানলার খোলা অংশের দিকে।

বুড়ো পায়রা ডেকে উঠলো: বলো তো গিন্নি, এদের বাড়ীর বাচ্চা ছেলেটা কি চায়? দেখেছ, ও যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে এই দালানে ঘুর ঘুর ক'রে বেড়ায়?

পায়বা-গিন্নী সারা দেহ ফুলিয়ে ঘাড়ে মুখ ঢুকিয়ে আরাম ক'রে চোখ বুজে ছিল,—ঘাড়টা তুলে মুখটা একবার ঘষে নিয়ে কর্তাকে বললে: কি চায় জানো না? ও কেবলই জানতে চায়, শুনতে চায় ওর পূর্বপুরুষদের কথা, কি রকম ছিল তারা, তাদের সব গেলই বা কেন!

—কিন্তু জেনেই বা ও কি করবে?

গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: জেনে আবার করবে কি? তোমার সাতপুরুষ ধ'রে যে এই ভিটেয় বাস—সব জানো, তবুও তুমি কি পুরোনো কথা নিয়ে বলাবলি করো না? ও বাচ্চা ছেলে, ওর তো জানতে ইচ্ছা করবেই। মা'র কাছে যা শোনে তাতে ওর মন ওঠে না। দেখো না, ও এই কর্তাদের বড় ছবিগুলোর দিকে কেমন ক'রে তাকিয়ে থাকে!

—হ্যাঁ, তা তো দেখি, আর এদিক ছেড়ে ও যেতেই চায় না।

—ওদের কি না ছিল বলো। তোমার মা'র কাছে যে সব গল্প শুনেছি তার কি-ই বা ও দেখলো!

দেবল সবিস্ময়ে দেখলো—সন্ধ্যার মৃদু আলোক জানলা দিয়ে বৈঠকখানার ঘরের ভিতর পড়েছে—পিতামহ ও প্রপিতামহের প্রকাণ্ড ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে যেন কথা বলছে। প্রপিতামহের দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, খালি গায়ে শুভ্র পৈতার গোছাটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর সামনে পিতামহ নতমস্তকে দাঁড়িয়ে।···তিরস্কারের ধ্বনি অস্পষ্ট কানে আসে দেবলের, অন্য দিকে পায়রা-গিন্নীর গল্পের ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দ বক্ বক্‌ম, বক্ বক্‌ম।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হতে থাকে, পিতামহ সস্নেহ দৃষ্টিতে যেন দেবলকে আশীর্বাদ করেন। কি স্নেহময় মমতা-ভরা দৃষ্টি! দেবলের ইচ্ছা করে দৌড়ে গিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কিন্তু সে পারে না, কেমন যেন ভয় ভয় করে। আবার মুখ তুলে দেবল দৃষ্টিপাত করে বৈঠকখানার ঘরের দিকে। স্নেহপূর্ণ মুখটা ক্রমশঃ যেন মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের সঙ্গে, কেবল একটি কণ্ঠ শুনতে পায় সে ঃ তুমি আবার পূর্বপুরুষের গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবে। আমার বাবা, যাঁর ছবি দেখে তুমি ভয় পাও, তাঁর কথা চন্দ্র-সূর্য ওঠার মত সত্য, জীবনে তিনি মিথ্যা বলেননি, তাঁর কথা এইমাত্র শুনলে—তিনি বলছেন—তুমি পারবে, দেবল, তুমিই পারবে। ভয় কি দাদু, শক্তি রাখো মনে।—দেবল আর শুনতে পায় না। তার নিজের অজ্ঞাতে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—দাদু! দাদু!

সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় ঠাকুর-দালানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে—দাহু ! দাহু !

বিস্মিত দেবলের সকল দৃশ্যপট বদলে দিয়ে সন্ধ্যার শাঁখ বেজে ওঠে—পুঁ—উ—উ—

দেবল চোখ ফিরিয়ে দেখে ঠাকুর-দালানে প্রণতা মায়ের ছোট্ট মূর্তিটি। আবার বৈঠকখানার জানলা দিয়ে দৃষ্টি দেয়, কিন্তু অন্ধকারে ছবি হুটো মিশে গেছে। কানে আসে কেবল চিরদিনের বাসিন্দাদের পরিচিত সুর—বক্ বক্‌ম ! বক্ বক্‌ম !

বেচারা

সন্ধ্যাবেলা মাঠের ফিরৎ-এক-পা ধুলো মেখে আর এক-গা ঘাম নিয়ে সরাসর ঘরে ঢুকে গিয়ে পাখার সুইচটা খুলে দিয়ে অলক চেয়ারে ব'সে হাঁফাতে লাগলো। বল খেলাটা আজ বড্ড বেশী হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে দম বুঝি বন্ধ হয়ে যায়। চোখ বুজে অলক চুপ ক'রে রইল

—কিগো বাবুসাহেব, দেখতেই যে পাচ্ছ না, আমরা ঘরে আছি। মুখ ফিরিয়ে অলক দেখে খাটের উপর মাসী দিলুকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে। মাসী অলকের চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড় হ'লে কি হয়, ভাব ও ঝগড়ায় দুজনেই সমান। মেজাজ তখন অত্যন্ত খারাপ হয়ে আছে, কাজেই অলক উদাস হয়ে বললেঃ তাতে আমার ভারী বয়ে গেল।

—আমি এখখুনি ব'লে দেবো, পা না-ধুয়ে ঘরে এসেছ।

—যাও, দাও গে যাও।

—দিলু ঘুমুক তারপর—

দিলু পিটপিট ক'রে চাইছে। অলক বললেঃ ঘুমিয়ে একেবারে অর্ধেক রাত দিলুর, কাজেই এখন তুমি নালিশ জানাতে যেতে পারো।

দিলুর দিকে চেয়ে মাসী রেগে উঠলো : ওমা, এই নাকি ঘুম ? আমি পারবো না তোমায়।

দিলু একবার মাসীর দিকে একবার অলকের দিকে চেয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেললে।

—বুঝলি দিলু, গল্প না বললে ঘুমুসনি—অলক উপদেশ দিয়ে ব'লে উঠলো।

—পরের ঘটকালী করেন শ্রীমন্ত······নিজে যাও হাত-পা ধোও গে—মাসী অলককে বললে।

—তুমি দিলুকে ঘুম পাড়াও না—নিজের কাজ করো।

অলক আস্তে আস্তে উ'ঠে হাত-পা ধুয়ে জামা-প্যাণ্ট বদলে এসে দিলুর পাশে শুয়ে পড়লো।

দিলু তখনও ঘুমায়নি, হাতটা বাড়িয়ে অলককে ধ'রে চুপি চুপি কানের কাছে কি বলতেই, মাসী ব'লে উঠলো : আবার!

দিলু বালিশে মুখ গুঁজলো আর অলক বললে : গল্প ? তা এতক্ষণ বলিস নি কেন ? মাসী কী জানে যে বলবে ?

—শোন : এক মস্ত সমুদ্র, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সমুদ্র যাকে বলে। ভূগোলে পড়ি শুনিস নি ?

দিলু চুপ ক'রে আছে দেখে মাসী বললে : সমুদ্র, ভূগোল, এসব ওকি বুঝবে শুনি ?

—ঠিক বুঝবে, তারপর শোন : সমুদ্র, মস্ত নীল সমুদ্র, অথৈ জল, এপার ওপার দেখা যায় না। গঙ্গার চেয়ে বড়, অনেকগুলো গঙ্গা—

—তুই দেখেছিস সমুদ্র ?—মাসী ব'লে উঠলো।

—থামিয়ে দেওয়া তোমার স্বভাব, সমুদ্র দেখিনি ? সেবার যে

পুরী গেলাম আমরা, বলে কত চান করলুম ঢেউতে লাফালাম, মাছের নৌকায় উঠলাম—

—মাছের নৌকা কি দাদা? তাতে মাছ থাকে? দিলু ব'লে উঠলো।

—মাছ থাকে না, তাইতে চড়ে অনেক অ—নে—ক জলে যেতে হয়, কত বড় মাছ আনা হয়—কত সুন্দর মাছ, আরও কত কি যে আছে সমুদ্রে।

—বেশ থাকুক, দিলু চোখ বন্ধ করো তুমি—মাসী দিলুকে বললে।

চোখ বুজে দিলু বললে ঃ মস্ত মাছ দেখেছ দাদা, জলের নীচে আরো কত জিনিষ আছে—বেশ মজা না? ফিস্‌ফিসিয়ে দিলু ব'লে উঠলো।
—হ্যাঁ, সে অনেক গঙ্গা এক জায়গা করলে তারপর সমুদ্র হয়, মনে কর এমনি এক সমুদ্র আর তাতে কতই না মাছ, কত ধনরত্ন, আমি ধনরত্ন দেখিনি—কিন্তু কত মাছ যে দেখেছি—

—আহা, যেন সমুদ্রের ভিতর গিয়ে মাছ দেখেছ, এমন গল্প ফাঁদা, —মাসী বললে।

—তুমি ভয়ানক বাধা দাও মাসী, কথা বলতে দাও না কেন? তোমার মত ঝগড়ু লোক আমি একটিও দেখিনি—রেগে গিয়ে অলক ব'লে উঠলো।

—তুই বলছিস কেন যত সব বাজে বাজে কথা?

—তুই শুনছিস কেন? তোকে তো বলা হচ্ছে না—অলক এবার ভীষণ খাপ্পা হয়ে গেছে।

—দেখবি? মাসীর কণ্ঠস্বরও সপ্তমে বাঁধা।

—যাও, ঢের দেখেছি, বুঝলি দিলু? অলক বললে। উ—উঁ—উঁ শব্দ ক'রে দিলু ঘুম-জড়ান চোখে পাশ ফিরলে।

কিন্তু অলক আর স্থির থাকতে পাচ্ছে না, সেখান থেকে উ'ঠে পড়ার টেবিল, তারপর খাওয়া শোয়া, রাতে ঘুম পর্যন্ত তার যেন কেবল মনে হ'তে লাগলো কেমন ক'রে জলে নামা যায়। সমুদ্র নয়, গঙ্গা? তা মন্দ হয় না, কিছু যদি না হয় তাহ'লে পুকুর অন্ততঃ।

রাতে ঘুমিয়ে অলক স্বপ্ন দেখতে লাগলো সে যেন সমুদ্রে স্নান করছে, বড় বড় ঢেউগুলোর সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে কি মজাই না করছে। দিলু পাড় থেকে বিস্মিত চোখে দেখছে আর হাততালি দিয়ে উঠছে। * * * পরের দিন সকালে শোনা গেল—শ্রীরামপুর যাওয়া হচ্ছে, রবিবার ছিলই, তাছাড়া সেখানে ছিল জ্যাঠামশায়ের মেয়ের বিয়ে। দিলু সকালে খুব সেজে এসে অলককে সে খবর দিয়ে তৈরী হয়ে নিতে বললে।

শ্রীরামপুর! চমৎকার হয়েছে, গঙ্গা পাওয়া যাবে, স্নানও হবে বেশ—মনে মনে ভেবে অলক খুসী হয়ে উঠলো।

শ্রীরামপুর পৌঁছে দেখা গেল বাড়ীতে খুব হৈ চৈ, লোকজন, মোণ্ডামিঠাই, চেঁচামেচি। এসব কিন্তু অলককে খুসী করতে পারলো না। কিছুক্ষণ পরেই সে বেশ একটি রেজিমেণ্ট তৈরী ক'রে নিলে। কাকামণির মেয়ে অনু, ছেলে গোপাল, বড়মার মেয়ে তারা, শঙ্করদির ছেলে সুনু, তাছাড়া যারা এসেছিল তাদেরও বাচ্চাকাচ্চা চিকু, মীরু, গীতা—এ ছাড়া দিলু তো আছেই।

চুপি চুপি সব বেরিয়ে পড়লো। বাড়ীর দোরে গঙ্গা বললেও হয়

—কিন্তু বেলা তখন প্রায় দুপুর। মাথার উপর সূর্যিমামা ঝাঁ ঝাঁ করছে, ঘাটে জনপ্রাণী নেই।

—এখন নেয়ে দরকার নেই, বেড়িয়ে ফি'রে যাই চলো—অনু বললে।

সেই ভালো, বড় রোদ—গোপাল সম্মতি দিল।

—দূর, তোরা বোকারাম—গরমে তো জলে নামতেই হয়—না অলকদা ?—সুনু বেশ জোর দিয়ে ব'লে উঠলো।

—না বাবা, আমি নামছিনে, সেদিন বান ডেকেছিল—তারা বললে।

—তোরা হচ্ছিস ভীতুর দল, অলকদা কোলকাতা থেকে এসেছে, অত ভয় পায় না—কি অলকদা ?—সুনু জিজ্ঞাসা করলে।

—ভয় ? ভয় আবার কি ? এইসা সাঁতার দেবো তোরা অবাক হয়ে যাবি—বীরদর্পে অলক বললে।

—কিন্তু দাদা, সেদিন তুমি পা ভেঙে পড়েছিলে, মা বলেছে এখন কিছু করবে না তুমি—ভুলে যাচ্ছ ? আর সাঁতার তুমি জানো নাকি ?

অলক দিলুর উপর খাপ্পা হয়ে উঠেছে, মেয়েটা তাকে একেবারে যা তা ধারণা করিয়ে দিচ্ছে ? ধমক দিয়ে ব'লে উঠলোঃ থাম তুই দিলু, পা আমার, আমি বুঝবো। আর সাঁতার আমি কত দিয়েছি ইস্কুলের সঙ্গে গিয়ে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তো, নেমে পড় অলকদা বুঝলে ?—উৎসাহ দিলো সুনু। হাফপ্যাণ্ট, সিল্কের শার্টে সোনার বোতাম লাগানো—তার উপরই একটি গামছা জড়িয়ে অলক নেমে পড়লো—কোমর অবধি

জলে। সেইখানেই আছড়া-আছড়ি ক'রে জল ছিটিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলে সে সাঁতারে কত বড় ওস্তাদ।

কিন্তু সুনু সত্যিই সাঁতার জানে আর বোঝেও, হেসে বললেঃ এই তোমার ইস্কুলের সাঁতার অলকদা? আমি কিন্তু আরো ভাল পারি, মেয়ে ইস্কুলে শিখিনি।

লজ্জার বিষয় সত্যি! অলকের মাথা হেঁট হয় আর কি। তাড়াতাড়ি আর একটু এগিয়ে অলক বললেঃ এই দেখনা।

কিন্তু এরপর অলক আর পা রাখবার জায়গা পায় না। অকূল পাথার। উঠবার বহু চেষ্টা করতে লাগলো অলক, কিন্তু সব বৃথা। জল, জল আর জল—ক্রমশঃ গভীর জলে গিয়ে পড়ছে অলক। নাকে মুখে জল, শেষ পর্যন্ত হাঁপ ধরতে লাগলো।

সুনু নতুন ধরনের সাঁতার মনে ক'রে অবাক হয়ে দেখছে। দিলু হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো—দাদা ডুবে গেল!

—ডুবে গেল? য়্যা, তাইতো! তবে যে অলকদা বললেঃ ইস্কুলের সাঁতার? সুনু আর ভাববার অবসর পেলে না। দিলু তখন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। ছেলেমেয়ের দল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, কি করবে সব?

শেষবার এক চেষ্টা করতেই অলকের হাতের আঙুল ক'টি কেবল জলে ভেসে উঠলো—ব্যস!

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চীৎকার শুনে যখন তিনি এসে দাঁড়ালেন তখন শেষবারের মত আঙুলক'টি দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

জামা-কাপড় না ছেড়েই জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বহু কসরৎ ক'রে অলককে নিয়ে যখন ডাঙায় উঠলেন—তখন সে অচৈতন্য, সারা দেহ নীল হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে আপনা থেকে ঝাঁকুনি খাচ্ছে।

বিয়ে বাড়ীর কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে মা অলককে নিয়ে চ'লে এলেন কোলকাতায়।

নতুন ধরনের সাঁতার শেষ পর্যন্ত দেখানো হলো না বন্ধুদের—

বেচারা অলক !

শুধু তাই নয়—বিয়ে বাড়ীর আমোদ আর নিমন্ত্রণটাও মাঠে মারা গেল ভাবলে কি কম দুঃখ হয়— ?

বেচারা অলক !

হ্যাঁ, শ্রীরামপুরের রেজিমেণ্ট-এর সঙ্গে অলকের আবার দেখা হয়েছিল। ইস্কুলের সাঁতার সম্বন্ধে সুনু জিজ্ঞাসা করেছিল বৈ কি !

অলক বললে ঃ এ রকম কসরৎ তাদের সাঁতারের মাস্টারমশাই শিখিয়েছেন। কিন্তু আমি বলছিলাম—এ রকম কসরৎ না শেখাই ভালো, নয় কি ? তোমরা ভাই সাবধান হয়ো।

কিন্তু এখনও অলক বিছানায় শুয়ে আছে। সামনেই আবার একটা উৎসব আসছে, কিন্তু অলক তো এখনও বিছানায়।

বেচারা অলক !

তারা যদি কথা কইতো

পিণ্টু আজ কোনো কথা শুনবে না—বাজারে যাবেই। রোজ রোজ সে ভরতকে বলে বাজারে নিয়ে যেতে—কত কি জিনিষ বিক্রি হয় তা সে দেখবে—যা ছ'চার আনা জমেছে তা দিয়ে কিছু না কিছু কিনেও আনবে—অবিশ্যি কেনার কথাটা সে ভরতের কাছে ফাঁস করেনি—তাহ'লে যদি ভরত রাজী না হয়—কিন্তু এত খোসামোদ ক'রেও—দোক্তার জন্য ছ'চারটে পয়সা ঘুষ দিয়েও—কোনো ফলই হলো না, ভরত কেবলই আশা দিয়ে রাখে কিন্তু নিয়ে যায় না। কাল তো তাই একচোট বোঝাপড়া হয়েছে, অবশেষে যখন পিণ্টু কাঁদতে লাগলো তখন নীপুকা আর অরুণদা যুক্ত হয়ে কথা দিল—রবিবার দিন নিশ্চয়ই পিণ্টুকে তারা বাজারে নিয়ে যাবে।

একথা নীপুকা, অরুণদা ভুলে গেলেও পিণ্টু তো ভোলেনি। একটি একটি ক'রে গোনা দিন শেষ হয়েছে। প্রত্যেক দিন পিণ্টু কল্পনায় দেখে বৌবাজারের চওড়া রাস্তাটা সে গাড়ীঘোড়া এড়িয়ে দিব্যি পার হয়ে গেছে। বাজারের পশ্চিম দিকের গেটে ঢুকেই যে ফলওয়ালার দোকান—সেখানে গিয়ে সে আগে একজোড়া মর্তমান

কলা কিনবে—তারপর সোজা ঢুকে যাবে দু'ধারে সব্জী ইত্যাদির বিক্রিওয়ালাদের ফেলে। এসব দোকান আছে কিনা, সত্যিই সে জানে না, তবে ভরত যখন মাকে বাজারের হিসেব দেয়—তখন সেই সব কথা শুনে শুনে সে সব একটা কল্পনা ক'রে রেখেছে।

সেদিন ভরত বাজার থেকে এসে মাকে হিসেব দিচ্ছে আর বলছেঃ বাবা! আমি আর পারবো না মা, যা আক্রা গণ্ডা হয়েছে—তুমি বিশ্বাসই করতে চাইবে না। দর যদি কমাতে যাও, হাত থেকে কেড়ে নেবে—বলবে একটু মাছের জল খেয়ে যাও—মাছ খেতে হবে না।

পিণ্টু মনে মনে বলেঃ দাঁড়াও না, রবিবার গিয়ে সব জেনে আসবো—তারপর রোজ বাজার যাবো—একদিনও ভরতকে যেতে দেবো না। যদি পয়সা রোজ একটু একটু বাঁচাতে পারি—তাহ'লে যে সব জিনিষগুলো লিস্ট করা আছে তা সব কিনে ফেলবো এক এক ক'রে।

আজ সেই অনেক দিনের গোনা দিন শেষ হয়েছে।

আজ রবিবার।

পিণ্টু খুব ভোরে উঠেছে কিন্তু নীপুকা, অরুণদা তো বেলা পর্যন্ত ঘুমুবে—আজ রবিবার আবার। তারপর চা আর খবরের কাগজ নিয়ে বসবে—, তুমুল তর্ক হবে—পৃথিবীতে ঐ যে ছাই যুদ্ধ ব'লে কি জিনিষ আছে—তাই নিয়ে ওদের মাথাব্যথার অন্ত নেই। লড়াই তো সন্তুর সঙ্গে তার রোজ হয়—মারামারির পর ভাব হয়ে যায়, তা নিয়ে কেই বা মাথা ঘামাচ্ছে—বা তর্ক করছে। যত্তোসব বাজে কথা নিয়ে নীপুকা, অরুণদা এমন কি বাবা, জ্যাঠামণি, ছোড়দাদুর পর্যন্ত

মাথা ঘামানো আর সময় নষ্ট। আজকে নিশ্চয় ওদের অনেকক্ষণ ধ'রে বকাবকি চলবে। নাঃ, আগে থেকে তাড়া দিতে হবেই। পিণ্টু মনে মনে ঠিক করলো।

বার তিনেক চা খেয়ে—বাহিরের ঘরে খবরের কাগজ নিয়ে যেই নীপুকা আর অরুণদা ঢুকেছে—অমনি ঝড়ের মতো পিণ্টু এসে বললে: মনে আছে তো আজ রবিবার।

নীপুকা, অরুণদা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

পিণ্টু বললে: সেই মঙ্গলবার বলেছ আজ বাজারে নিয়ে যাবে।

ওঃ, তাই বল। এখন তো মোটে সাড়ে আটটা, সাড়ে ন'টার সময় যাবো—তখন আসিস।

একটা ঘণ্টা পুরো—রীতিমত অসহ্য পিণ্টুর। সন্তু এসে খেলতে ডাকলে—সগর্বে পিণ্টু উত্তর দিলো: না, আজ আর খেলা নয়, আমি আজ বাজার যাবো।

সাড়ে ন'টা বাজতেই পিণ্টু আবার বৈঠকখানার দরজায় হাজির। নীপুকা বললে: চল চল—যা ভরতকে ঝুড়ি আর মাছের জালতি আনতে বল।

আবার ভরত! পিণ্টু বললে: ভরত কেন, আমি তো আছি। অরুণদা হেসে বললে: রবিবারের বাজার তুমি আমি পারবো না, ভরত না গেলে মুটে করতে হবে।

—তাই করবে, ভরত এখন ওপরের ঘর মুছছে।

আচ্ছা, যা, মা'র কাছে টাকা চেয়ে নিয়ে আয়। একলাফে পিণ্টু ওপর ঘুরে এলো—হাতে একটা দশটাকা ও একটা পাঁচটাকার নোট অন্যহাতে মাছের জালতি। অরুণদা আর নীপুকা ওর চেহারা দেখে

হেসে ফেললে। বাজারে ঢুকবার একটু আগে বাঁদিক ঘেঁষে যে দোকানটায় সাইন বোর্ডে লেখা—বাঙালীর পাঁঠার দোকান—সেখানে অরুণদা হেঁকে বললে ঃ পীতাম্বরদা, আড়াই সের ভালো মাংস রাখো —মেটে দিও। ফিরবার সময় নেবো। আর শোনো, এই নোটটা ভাঙিয়ে দাও তো!

পীতাম্বর পানে কালো দাঁতগুলি বার ক'রে একগাল হেসে বললে ঃ এই যে—নাও।

এবার পিণ্টুকে নিয়ে ওরা আর এক মাথায় ঘুরে অন্য গেট দিয়ে ঢুকলো। আর কি সুন্দর ফুলের গন্ধ—ছ'পাশে ফুলের দোকানে নানারকম ফুল—তারই সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আর একটু এগিয়ে গেলেই তরকারী, নানা সব্জীর ডালা সাজিয়ে ব্যাপারীরা ব'সে আছে। অরুণদা বললে ঃ নীপুকা ভালো ক'রে দেখে-শুনে সব কিনো ভাই, না হ'লে আজ আর রক্ষে থাকবে না বাড়ীতে।

নীপুকা তখন উবু হয়ে পাশের ঝুড়িতে টাটকা বড় করলা আর কালো শিরওয়ালা বড় বড় পটল দর করতে লেগে গেছে।

পিণ্টু খুশীতে উপচে পড়ছে। হঠাৎ তার মনে হলো ভরত ছোট শুকনো পটল নিয়ে গেলে মা রাগ ক'রে বলেন ঃ এই কুচ্ছিত পটল-গুলো আনিস কেন—বেশ বড় বামুন পটল আনতে পারিস না?

—বামুন পটল আবার কি?—ভরত চোখ কপালে তোলে।

বড় কালো শিরওয়ালা টাটকা পটল, আমার শাশুড়ী বলতেন, বামুন পটল আর এগুলো মেথর পটল—মার জোরে হেসে ওঠার কথাও পিণ্টুর মনে হলো। কিন্তু ও কি!—ঝুড়ির পটলগুলো ন'ড়ে-চ'ড়ে

করলার কাছে গিয়ে ফিসফিস ক'রে ব'লে উঠলো ঃ ও দিদি শুনছো,—ওদের পিণ্টু নাকি সস্তায় আমাদের কিনে নিয়ে যাবে।

করলাদিদি মাথার বোঁটাটা একটু সিঁটকে বললেঃ সে তোদের, আমার গায়ে যা তেতো, পিণ্টুরা খায় না—কেবল ওর দাদু মাঝে মাঝে চেঁচায় করলার শুক্তো করো ব'লে।

আর পাশাপাশি ক'টা ঝুড়িতে ডুমুর, কাঁচা লঙ্কা আর ঝিঙে ছিল, একসঙ্গে সবাই ব'লে উঠলো ঃ আরে জানো না বুঝি—ও এসেছে সব কিনতে—মনে মনে ঠিক করেছে চাকরটাকে আর পাঠাবে না—পয়সা বাঁচাবে, তা দিয়ে অন্য সব জিনিষ কিনবে—বুঝলে পটল খুড়ো।

লাল কুমড়া দু'ফালি হয়ে প'ড়ে আছে—বিচিশুদ্ধ দাঁত বা'র ক'রে ব'লে উঠলো ঃ তা বাঁচাক না পয়সা, তোদের কি ? ছেলেটা এসেছে তোরা অমন করছিস কেন ?

—ঐ যাঃ, করলাদিদি তো চললো মুটের মাথায়—কাঁচা লঙ্কা চিটপিটিয়ে ব'লে উঠলো।

—এবার পটল খুড়ো আর কুমড়ো কর্তার পালা,—ঝিঙে কথাটা ব'লেই মুখ ঢাকলো।

—হুঁ, হুঁ কেউ বাদ নয়, সবাইকে যেতে হবে—নীপুকা তো এগিয়ে আসছে।

পিণ্টু তন্ময় হয়ে শুনছে—এরা বলে কি ? বেগুনের ঝুড়িতে কালো বড় বড় বেগুন এবার কাঁটা বা'র ক'রে পুঁইডাঁটাকে বললে ঃ খুব তো কচি কচি পাতা বা'র ক'রে বাহার দিচ্ছ—ওঠগে এবার পিণ্টুদের মুটের মাথায়।

—এই তো সকালে আমাকে মাচা থেকে কেটে এনেছে, এর মধ্যে তরকারী হ'তে উনুনে যেতে হবে?—কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে পুঁইডাঁটা।

—তা আর কি করবে, চচ্চড়ি খাবার সাধ হয়েছে পিণ্টুর দিদির—ফোঁড়ন দিল কোণের দিক থেকে যজ্ঞিডুমুর।

—দাঁড়াও না, পেট কামড়ানো ধরিয়ে দেবো, মানুষগুলোর জ্বালায় বাঁচবার উপায় নেই।

মানকচু আর ওল পাশাপাশি গলা জড়িয়ে গল্প করছিল, দুজনে একসঙ্গে বললেঃ তা যা বলেছ দিদি। মাটির তলা থেকে বা'র ক'রেও খাবে।

পিণ্টু ভীষণ ঘাবড়ে গেছে, এরা তো সাংঘাতিক লোক। আজ তাহ'লে দিদিকে পুঁইডাঁটা খেতে বারণ করতে হবে—যা ডাঁটা চিবোয় দিদিটা, পাতের কাছে যেন পাহাড় হয়।

অরুণদা বললেঃ এদিকে তো সব হলো—ফল আর মাছ হ'লেই হয়—আয় পিণ্টু!

পিছন ফি'রে তাকাতে তাকাতে পিণ্টু হাঁটছে—যা ভিড়, লাগলো একজনের সঙ্গে ধাক্কা—।

—বাচ্চা ছেলেদের বাজারে আসা কেন বাপু!—ব'লে উঠলো সামনের লোকটি।

পিণ্টু রাগ ক'রে একবার তার দিকে তাকালো—না, তা আসবে কেন, কেবল তোমরাই আসবে।

বড় ছোট গলা কাটা কাটা মাছের মুড়োগুলো বারকোষে সাজান—চোখগুলো যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার পাশে বড় বড়

বঁটী নিয়ে ব'সে আছে মেছুনীরা, আরও এগিয়ে গেলে ছোট-বড় নানা মাছের ডালা। কুচো চিংড়ি অবধি আছে।

পিণ্টু মুড়োগুলোর কাছে আসতেই—সবচেয়ে বড় মুড়োটা ব'লে উঠলোঃ কিনতে এসেছ তো? জানো এরা আমাকে ধ'রে এনে কেটেছে—আমার সাজানো সংসার জলের তলে রয়েছে, মানুষের ওপর আমার কি রাগ আছে তা বলতে পারি না। শুধু শুধু এনে কাটলো—।

মুখটা হাঁ হয়ে গেছে বড় মাথাটার—ভিতর অবধি খাঁ খাঁ করছে—। ভয় পেয়ে পিণ্টু অরুণদাকে ঘেঁষে দাঁড়ালো।

বড় একটা আস্ত মৃগেল লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল—ঐখানেই। ল্যাজটা নেড়ে বললেঃ আমি সকলকে ছেড়ে চ'লে এসেছি অর্থাৎ জাল ফেলে এনেছে শুধু শুধু মানুষদের ভোজের জন্য। দাঁড়াও না, মজা দেখাচ্ছি, পেটের ভিতর ঢুকি একবার।

ছোট ছোট বাটা মাছগুলো কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেঃ দেখ না কাকা, আমাদেরও মা-বাবার কাছ থেকে কেমন ক'রে ছিনিয়ে এনেছে! জেলেগুলো আমাদের নিয়ে কি দর করে, মোটা পয়সা নিয়ে চ'লে যায়—এত পাজী ওরা।

মোটা দাড়া নেড়ে ঘিওয়ালা মাথাটা বেঁকিয়ে চোখ বা'র ক'রে গলদা চিংড়ি বললেঃ দাম যদি বেশী নেয় সে আমায় দিয়ে—মাথার এই টকটকে লাল ঘির দামই আলাদা—তবে সহ্য হয় না বেশী খেলে মানুষের। আমরা হলাম গিয়ে—

বলা শেষ হলো না—সুড়সুড় ক'রে পিণ্টুদের মুটের মাথায় বসতে হলো, সবচেয়ে বড় রুইএর মাথাটা ইতিমধ্যেই চ'লে গেছে।

পিন্টু আর ঘুরতে চায় না—সকলের সব কথা শুনে সে রীতিমত ভয় পেয়েছে। আর কোনো দোকানে সে দাঁড়াতে রাজী নয়—এদিকে অবিশ্যি কাজও শেষ হয়েছে।

বাড়ী এসে মুটে যখন জিনিষগুলো ঢেলে দিচ্ছে, পিন্টু আস্তে আস্তে সেগুলোর কাছে এসে দাঁড়ালো। ভরত তখন সব্জী সরিয়ে মাছগুলো তুলে নিচ্ছে কাটবার জন্য। রুই-এর মুড়ো দেখে মা বললেন: আজ মুড়িঘণ্ট হবে—পিন্টু খেতে ভালবাসে।

—না, না, আমি মুড়িঘণ্ট খাবো না—পিন্টু চীৎকার ক'রে ওঠে।

ভরত ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: তা' না খাও গে, সর দিকি, আমি মাছ কাটি। বাজারে যাবার জন্য তো কান্নাকাটি, এসে অমন গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সখ মিটেছে?

পিন্টু রেগে ভরতের পিঠের উপর গুম গুম ক'রে ক'টা কিল বসিয়ে দিল: হ্যাঁ মিটেছে, তোমার কি!

মা ব'লে উঠলেন: ও কি হচ্ছে পিন্টু!

কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল, পিন্টু সন্তুকে বলছে: জানিস সন্তু, মুড়িঘণ্ট খাসনি, গলদা চিংড়িও নয়—।

—কেন? কেন? সন্তু জিব দিয়ে ঠোঁটটা চেটে বললে: কি সুন্দর রান্নার গন্ধ বেরিয়েছে পিন্টুদা, আর তুমি বলছো—

—তবে যা, খেয়ে মরবি—রাগ ক'রে উঠলো পিন্টু।

পিন্টু আর কোনোদিন বাজারে গিয়েছিল কিনা ভরত, নীপুকা বা অরুণদাকে তা জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

ছবি

তোমরা যে যুগে জন্মেছ, সে যুগে কেবলি হানাহানি। মানুষ রক্তলোলুপ, নৃশংস দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছে। মনে কর গত উনচল্লিশ সালের কথা, জার্মান যেদিন বিপুল বিক্রমে বৃটিশ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর ধ'রে যে দিনগুলি চলে গেছে, তার রক্তরাঙা দিনগুলি তোমরা, আমরা কেউই ভুলতে পারিনি। মানুষের অন্ন-বস্ত্রের কি নিদারুণ বীভৎস দৃশ্য! গ্রাম থেকে দলে দলে যে ক্ষুধার্তের দল কোলকাতার রাজপথ ফুটপাত ভরিয়ে তুলেছিল, 'মা, একটু ফ্যান দাও'—এই আর্তস্বরে, সে ছবি ক্রমশঃ ঝাপ্‌সা হয়ে এলেও তোমরা, আমরা কেউই ভুলতে পারিনি! নিরন্ধ্র কোলকাতা নগরীতে শ্বাপদের পদধ্বনি যেন কঠিনতর হয়ে উঠতো, আর চোখের সামনে সেই কঙ্কাল-সার ভুখা মিছিলের দল, কেউ পথে, কেউ ফুটপাতে, একমুঠো অন্নের অভাবে মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিচ্ছে···এ দৃশ্য কেউ আমরা ভুলিনি।

যুদ্ধের দামামা থেমে গেল।

দেশ সুস্থ, সুস্থির হয়ে উঠবার সময় না দিয়েই সুরু হোলো হানাহানি, সে হানাহানি ভায়ে ভায়ে। এই হানাহানিতে কত নিরীহ, নির্বিরোধী লোক মারা গেল এবং তার সংখ্যা যে কত তা যেন নির্ণয় করা যায় না। আমাদের কারুর ভাই গেল, কারুর বাবা গেল, কারুর ছেলে গেল—এই 'গেল রে' শব্দ যেন গণনায় শেষ হয় না।

১৫ আগস্টের স্বাধীনতা উৎসবের ভিতর মিলনের যে মহৎ ছবি ও দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছিলাম তার মর্যাদা কতটুকু দিতে পেরেছি !

একটা ছোট্ট গল্প বলি শোন: আমাদের পাড়া কোন দল বা সম্প্রদায়ের পল্লী নয়। কিছু দিন আগে পর্যন্ত জাতিধর্মনির্বিশেষে একই পাড়ায়, একই বাড়ীর বিভিন্ন ফ্ল্যাটে বাস করেছে, আজও সে দৃষ্টান্তের চিহ্ন আছে। পাশাপাশি দোকান নিয়ে নির্বিরোধেই তারা দিন যাপন করে।

কিন্তু সেদিন যখন অকস্মাৎ দ্বিপ্রহরের সূর্য মাথার ওপর সহস্র শিখায় আগুন জ্বালিয়ে উঠলো—চোখের সামনে দেখলাম অবাধ লুঠ আর নৃশংস হত্যালীলা, কানে শুধু আসে 'মার মার' রব ! দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে, এ কী ! এরা কি উন্মাদ ?

তখন মানুষ আর মানুষ নেই, হিংস্র উন্মত্ততায় সমস্ত ভেঙেচূরে ছারখার হয়ে গেল, তারপর লুঠ, তারপর অগ্নিকাণ্ড। আগুনের শিখার ভিতর যেন কার আর্তস্বর শোনা যায়—'সংহর, সংহর'।

বড় বড় দমকল এসে রাজপথ ভরিয়ে দিল, আগুন নিভলো বটে, কিন্তু অন্তরাগ্নি তখন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। মানুষ যে যেখানে পারলো পালালো, যারা না পারলো কেউ মরলো অস্ত্রাঘাতে, কেউ মরলো আগুনে, কেউ মরলো বন্দুকের গুলিতে।

কোণের দিকে ছোট বস্তি, ঠিক বস্তি বলা চলে না—আট-দশ ঘর পশ্চিমা, দুই সম্প্রদায়েরই—বাস করতো। তাদের পেশা, কারুর রিক্সা টানা, কারুর পানের দোকান, কেউ তাদেরই মত যারা তাদের জন্য ভাঁড়ের চা আর বেসন-গুড়ের ফুলুরি বানায়—ছোট্ট দোকানটিতে ব'সে, কেউ বা কেবল মোট ব'য়েই চলে। প্রায় সব ঘরেই এরা স্ত্রীপুত্রসহ বাস করে।

এর উল্টো দিকে প্রকাণ্ড রাজপথ। প্রশস্ত সেন্ট্রাল এভিনিউ ঈষৎ বাঁক নিয়ে চ'লে গেছে কতোদূরে। সেন্ট্রাল এভিনিউ'র এদিকে প্রকাণ্ড কাফিখানা। সুস্থ অবস্থায় দেখা যায় সন্ধ্যা হবার পূর্বেই কত রং-বেরং-এর পোযাক প'রে কত রকমের লোক এই কাফিখানায় ভিড় জমায়। পথের দিকের ছোট্ট বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আমি এদের জীবনযাত্রা দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, প্রতিদিনকার ইতিহাস আমি মুখস্থ ব'লে দিতে পারি।

সকাল হ'লেই লরী এসে দাঁড়ায় কাফিখানার সামনে, শাক, সব্জী, মাছ, মাংস, ডিম ঝুড়ি ঝুড়ি নামিয়ে দেয়। আর খানিক পরে আসে বিভিন্ন বেকারীর ছোট ছোট গাড়ী, নামিয়ে দেয় রুটি ও বিস্কুটের বোঝা, আরও একটু পরে ধীর মন্থর গতিতে আসে কালো রং-এর প্রকাণ্ড ও উঁচু এক বিরাট লরী, তার থেকে নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রঙীন জল, হরেক রকম তার স্বাদ ও গন্ধ। কত দিন ঝুড়ি নামাবার সময় হাত পিছলে ঝুড়ি পথে প'ড়ে গেছে—কাঁচের টুকরোয়, রঙীন জলে, কুলীর পায়ের রক্তে স্থানটি ভ'রে উঠেছে। এসব দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, বিকেল হতেই দেখেছি, গাড়ীর সমারোহ ও বিভিন্ন পরিচ্ছদের মানুষ—রাত্রি বারটা বাজলে তখন কাফিখানার বাতি নিভলো, কিন্তু জ্বলতে

লাগলো সেই কাফিখানার নাম বুকে নিয়ে যে কাঁচের বাক্সটির ভিতর বড় আলো।

একটু দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে কোণের দিকে চোখ ফেরালে দেখি সেই যে ছোট্ট বস্তিমত স্থানটি। এদের বাড়ীর ইতিহাসও আমি মুখস্থ ক'রে ফেলেছি। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসার আগেই এদের বাড়ীর মেয়েরা বাইরের কারখানার কাজ সেরে ঘরে ফি'রে ঘর-দোর পরিষ্কার করে, স্নান সেরে আগুন জ্বালায়, প্রতি ঘরের লোহার উনুনের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে ওঠে—একেবারে অন্ধকার। কারুর উনুনে ঘটি ক'রে ডাল রান্না হচ্ছে, কারুর বা ভাত, কারুর রুটি সেঁকার তাওয়ার শব্দ, বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা খাবারের জন্য মায়ের কাছে তাগাদা জানাচ্ছে। এই ভাবে ভাত ডাল বা ডাল রুটি, কোনো দিন বা একটু মাছের টিকলী—এই রান্না শেষ হতেই পুরুষরা এসে পড়ে। মোটা পিতলের থালায় পুরুষকে মোটা ভাত বেড়ে দিয়ে, অন্য একটা থালায় ভাত ঢেলে মা ছেলে-মেয়ে নিয়ে একসঙ্গেই খেতে বসে। মায়ের পেট ভ'রে খাওয়া কোনদিন হয়, কোনদিন হয় না। তবু পরম তৃপ্তিতে মা বাচ্চাদের খাইয়ে সব ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে কুপির আলোতে ছেলে-মেয়েদের গল্প বলে। তারা ঘুমিয়ে পড়লে মাও শুয়ে পড়ে। আবার ভোর বেলা—তাদের মুড়ি বা বাসি রুটি দিয়ে মায়েরা, বাবারা কাজে বেরিয়ে যায়—ছেলেমেয়েরা ঘরে বা পথের সামনে ব'সে খেলা করে, সন্ধ্যার আশায় ব'সে থাকে—এইভাবে চলে তাদের প্রতিদিন। পূজায়, হোলিতে বা ঈদ-এর সময় দেখেছি কেউ একটু নতুন জামা পরেছে, কেউ দুটো নারকেলের সন্দেশ খাচ্ছে, কেউ দু'গাছা কাগজের

মালা এনে দরজার সামনে টাঙিয়ে দিয়েছে। এছাড়া এদের পরিবর্তন নেই।

সেদিনের আকস্মিক বিরোধের হানাহানি ও রক্তপাতের সময় কে কোথায় ছিটকে পড়লো তার ঠিক নেই। যারা কাজে গিয়েছিল তারা আর ফিরলো না, যে মায়েরা ঘরে ছিল তারা যাদের পেলে তাদের নিয়ে কোথায় গেল কিছুই ঠিকানা নেই। কেউ গেল, কারুর শবদেহ পথের উপর পড়লো—খানিক বাদে রেডক্রশের গাড়ী আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গাড়ীতে স্থানলাভ করলো। অদূরে কাফিখানা ভেঙে-চূরে ছারখার। তাদের যে পারলো পালালো—না পারলো শত্রুর হাতে প্রাণ দিল, জিনিষপত্র ভারে ভারে লুঠ হ'তে লাগলো।

সূর্য পাটে নামবার আগেই শ্মশানের নিস্তব্ধতা। মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তার মধ্যেই জনবিরল পল্লী, প্রায় আবর্জনা-স্তূপে পরিণত হয়ে উঠলো।

রাতে নামলো অঝোর ধারায় বৃষ্টি, বুঝি বা মায়ের আঁখিজল। পরের দিন সারা দিনরাত সমান তালে বৃষ্টি, বিরাম-বিশ্রাম-হীন জল-ধারা। আরও একদিন কেটে গেল।

ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল শান্তি-সেনার দল আর শোনা গেল 'এক হো' রব।

ধীরে ধীরে অন্ধকার মুক্ত হয়ে—আলো জাগলো—মানুষ যেন প্রাণ পেল।

বারান্দার সেই কোণটিতে দাঁড়িয়ে আছি, ভাবছি পরিচিত ছবি আর হয়তো চোখে আসবে না।

সবুজ লরী দ্রুতগতিতে এলো, বেকারীর গাড়ী এলো, সব শেষে এলো কালো বিরাটকায় লরী—কোনদিকে না চেয়ে বোঝা নিয়ে নামলো লোক—এ কি ? কাফিখানার দরজাগুলি টুকরা হয়ে রাস্তায় প'ড়ে, কাঁচের বাসনের ভাঙা স্তূপ, লুঠ-তরাজে বীভৎস কাফিখানা, জনমানবের চিহ্ন নেই···। লোকটা নির্বাক বিস্ময়ে খানিক দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ধীরে ধীরে ড্রাইভারের পাশে বসলো—গাড়ীটা দুলে উঠলো, তারপর চ'লে গেল গন্তব্য পথে।

আর একটু পরে দেখলাম—ভাঙা বস্তির স্তূপ থেকে বেরিয়ে আসছে দু'টি ছেলে-মেয়ে হাত ধরাধরি ক'রে। অনেক কেঁদেছে তারা, ভীতি-বিবর্ণতার ছাপ এখনও মুখ থেকে মুছে যায়নি। কোথায় তাদের কে চ'লে গেছে ; ম'রে গেছে তারা জানে না। দু'দিন বাদে ক্ষুধার তাড়নায় দু'জনে বোধ হয় বেরিয়ে পড়েছে।

এরা আমার পরিচিত কিনা দেখবার জন্য ভালো ক'রে দৃষ্টি ফেরালাম। হ্যাঁ, প্রতিদিন এরা দু'জনে খেলা করতো, হাইড্রেনের জল নিয়ে ছিটাতো, মারামারি করতো, আবার খাবার পেলে কাউকে না দিয়ে খেতো না—একদণ্ড কাছ ছাড়াছাড়ি হতো না, এরা তো তারাই —রহিম পানওয়ালার ছোট্ট ছেলে আকবর আর ফুলুরীওয়ালা লছমন সিং-এর সাত বছরের মেয়ে কলাবতী···।

বন্ধু

এমনই ঘটে যা আমরা ভাবতেও পারি না।

ধর এমন তো আমরা চোখের উপর অবিরাম দেখতে পাচ্ছি—আজ যে প্রাসাদে বাস ক'রে জুড়ি-গাড়ী হাঁকাচ্ছে—তাকেই একদিন দেখা যাচ্ছে বিপরীত অবস্থায়—আবার অনেক দুঃখ-দারিদ্র্যের মাঝে দিনপাত করতে হয় এমনি লোক হঠাৎ একদিন আলাদীনের ঐশ্বর্য পাওয়ার মতো বড় হয়ে উঠলো। এ রকম ঘটনার কথা তো আমরা বহু শুনেছি।

শিয়ালদার মোড় থেকে হেঁটে হেঁটে সারা বউবাজার স্ট্রীট ধ'রে রমু ময়দানে খেলা দেখতে যায়—ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই—এ তার

অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। এক-পা ধুলো ও এক-গা ক্লান্তি নিয়ে যখন বাড়ী এসে পৌঁছোয়, মা তার মুখের দিকে চেয়ে করুণায় বিগলিত হয়ে বলেন : এত কষ্ট করবার কি দরকার—তা ছাড়া মাঝে মাঝে ট্রামে গেলেও তো পারো।

রমু হেসে হাত-পা ধুয়ে পড়তে চ'লে যায়।

পড়তে পড়তে সারাদিনের অসীম ক্লান্তিতে যখন ঢুলতে সুরু করে—তার মাঝে সে দেখতে পায়—ময়দানের খেলোয়াড়দের—আর দেখতে পায় শিয়ালদা স্টেশনের বাইরের রাস্তার উপর অসংখ্য বাস্তুত্যাগীর ভিড়ের মধ্যে সেই হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি যে প্রত্যেক দিন এসে তার কাছে অনেক খবর জানতে চায়—শুধু সে জানতে চায় তাই নয়, রমুও তাদের দেশের সব খবর জানতে চায়।

রমুর এই ছোট বন্ধুটি যখন তাদের দেশের কথা বলতে থাকে তখন তার নিষ্প্রভ চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এই ভাবে দিনের পর দিন তাদের বন্ধুত্ব জমে ওঠে।

রমুর অপেক্ষায় তার বন্ধু অপেক্ষা ক'রে থাকে। গল্প শুনতে শুনতে কতদিন যে রমুর দেরী হয়ে যায়—তার ঠিকানা নেই—বকুনিও খেতে হয় বৈকি।

দিন চ'লে যায়—রমুর বন্ধু নীলু একদিন খবর দিল—এখান থেকে এবার তারা চ'লে যাবে, আর হয়তো দেখা হবে না। রমুর মুখ ম্লান হয়ে যায়—জিজ্ঞাসা করে—কবে, কোথায় যাবে? নীলু বলে : জানি না তো ভাই—কেবল চ'লে যেতে হবে তাই শুনেছি। আমি মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে তোমায় বলবো।

জনবহুল রাস্তায় একটা লাইটপোস্টের নীচে বসে ওরা যখন দু'জনে গল্পে সব ভুলে গেছে—সেই সময় একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলে এসে ডাকলো—নীলুদা !

নীলু তাকিয়ে দেখে বললে ঃ আয় তপু।

তপু এসে দাঁড়ালো, মুখ তার ম্লান।

নীলু বললে ঃ বসবি না আমাদের কাছে ?

—না যেতে হবে।

—এখন কোথায় যাবি ? সন্ধ্যে হয়ে আসছে যে !

তপু চুপ ক'রে ছলছল চোখে তার দিকে তাকালো।

—ওঃ বুঝেছি, আচ্ছা যা ভাই, বেশীদূর যাস্‌নি যেন ! আমি এখানে রইলাম তুই এলে একসঙ্গে ফিরবো।

তপুর মুখে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটলো তারপর সে আস্তে আস্তে পা বাড়ালো।

তপুর চলার পথের দিকে চেয়ে নীলু বললে ঃ জানো রমুদা, এই তপুরা আমাদের গ্রামের লোক—ওরা কী ভালো আর কেমন ছিল যদি জানতে তুমি—

—কি রকম ?

—ওদের কী না ছিল বল ? গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, বাগানভরা ফসল—বারো মাস পালা-পার্বণ লেগেই আছে। ওর মা এত ভালো—সবাই তাঁকে ভালবাসতো—কি যে হলো ভাই ! আমরা যখন চ'লে আসি—তপুর মা অনেক কষ্টে ওকে সঙ্গে নিয়ে এলেন—ওর বাবা আর একজন দাদাকে পাওয়া গেল না। ওর সেই লক্ষ্মীর মত মা আমার মায়ের কাছে রোজ কত কাঁদেন !

রমু এসব শুনছে ; কিন্তু কল্পনায় মন চ'লে গেছে তার তপুদের সেই গ্রামে—যেখানে আকাশের নীল আর বনের সবুজ মিশে গেছে। সেই গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ আর সোনার ফসলে ভরা মাঠ—সেখানে বারো মাসে তের পার্বণে গ্রামের ছোট বড় এক হয়ে মিলে আনন্দ করে। নীলুর মুখে শুনে শুনে রমু একেবারে একটা ভালো ছবি এঁকে নিয়েছে মনে মনে।

নীলু তখনও ব'লে চলেছে—এই তপু কী যে ভালো, আর সবাই ওকে কী যে ভালবাসতো রমুদা, তোমায় কী বলবো! ওদের বাড়ীর খাবার লোকে খেয়ে ফুরোতে পারতো না, কত লোককে বিলিয়ে দিত। আর আজ তপুর একবেলাও পেট ভ'রে খাওয়া হয় না!

রমুর যেন চমক ভাঙলো : কী বলছো, খাওয়া হয় না ঐ বাচ্চা ছেলের ?

নীলু একটু হাসলো—বড় করুণ হাসি। বললে : শুধু তপু—আমাদের ওদিকে একদিন এসো, দেখে যেও সব অবস্থা।

রমুর নরম বুক যেন মোচড় দিয়ে উঠেছে—আত্মগত ভাবে বলতে লাগলো—খাওয়া হয় না, খাওয়া হয় না—আর আমরা ওর চেয়ে বড়, চারবার পেট ভ'রে খাই!

রমু, তপুর কোমল মুখখানি ভাববার আর একবার চেষ্টা করলো।

নীলু তখনও ব'লে চলেছে—তপু এখন কোথায় গেল জানো রমুদা ? আজ সারাদিন ওর খাওয়া হয়নি, আমি ওকে আমার সঙ্গে খেতে ডেকেছিলাম কিন্তু মায়ের খাওয়া হয়নি মনে ক'রে এলো না—

—কিন্তু কোথায় গেল তপু ? আমার কাছে পয়সা আছে, আট আনা পয়সা আজ মা দিয়েছে—মাঝে মাঝে ট্রামে যেতে বলেছে কিনা

তাই—এই পয়সায় নিশ্চয় তপুর পেট ভরবে—উত্তেজিত হয়ে রমু ব'লে উঠলো।

—কিন্তু ওতো খাবে না রমুদা, ওর মার যে খাওয়া হয়নি—নীলু বললে।

—আচ্ছা ওকে ডাকো—আমি বললাম।

নীলু এদিক ওদিক চেয়ে কিছুদূরে একটা জায়গায় দৃষ্টি দিয়ে আর চোখ ফেরালো না, শুধু আস্তে আস্তে বললে ঃ ঐ যে তপু দাঁড়িয়ে।

রমু চোখ ফিরিয়ে দেখলো—পুলিশের ইঙ্গিতে দু'খানা বৃহদাকার উজ্জ্বল মোটর থেমে আছে—তপু তার সামনে দাঁড়িয়ে ছলছল চোখে হাত দু'টো বাড়িয়ে দিয়েছে। কোনরকম সাহায্য করার কথা মোটরের অধিকারী ভাবতে পারলেন না—মুখ বা'র ক'রে তীব্র ভাষায় ব'লে উঠলেন ঃ মরবে যে গাড়ী চাপা প'ড়ে—এখানে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে কী হবে—

বাধা দিয়ে পরবর্তী গাড়ীর আরোহী ব'লে উঠলেন ঃ খেটে খেতে পারো না—এমনি ছোট চাকরের দরকার তো সব বাড়ীতেই, তা না, কেবল ভিক্ষে দাও, ভিক্ষে দাও!

অপমানে, লজ্জায় তপুর কচি মুখ লাল হয়ে উঠেছে—তবু সে মায়ের উপবাস-ক্লান্ত মুখখানি মনে ক'রে, আর একবার কী বলতে চেষ্টা করলো। আরোহী তখন তীব্রভাষা থামিয়ে পাশের সঙ্গীর সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তি দূর করা উচিত সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেছেন।

তপু ভেবে পায় না কী করবে, সমস্ত লজ্জা, সঙ্কোচ দূরে ঠেলে সে আবার চেষ্টা করলো আর একবার চাইবার। কিন্তু চোখ তুলে যখন সে কথা বলতে গেল—তখন গাড়ী বহুদূরে চ'লে গেছে—কিন্তু তার

পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঐ মোড়ের চানাচুরওয়ালা, সে সারা বিকেল ধ'রে বেশীরকম কথা ব'লে চানাচুর বিক্রির চেষ্টা করেছে। সে তার মলিন পকেট থেকে একটি টাকা বা'র ক'রে, তপুর হাতে দিয়ে বললে : তুমি নিয়ে যাও ভাই, আর ওদের কাছে কোনদিন ভিক্ষা চেয়ো না।

তপু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

চানাচুরওয়ালা তখনও বলছে—যাও, বাড়ী যাও ভাই, কত হয়তো বাড়ীর লোক তোমার জন্যে ভাবছে।

দূরে দাঁড়িয়ে নীলু আর রমু দেখছিল এই দৃশ্য, চানাচুরওয়ালার সারাদিনের উপার্জন হয়তো ঐ একটা টাকা—যা সে অনেক কথা ব'লে, অনেক সুরের গাঁথনিতে গেঁথে—সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বিক্রি করেছে।

রমু দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে!